বৈশাখ
শিশু সাথী
১৩৭৩

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুতাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো অবলুপ্তির পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optimcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শিশুসাথীর নিয়মাবলী

১। শিশুসাথীর চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক—৫৲, ষাণ্মাসিক—২·৫০। প্রতি সংখ্যা ·৫০ নয়া পয়সা। **চাঁদার টাকা—"বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫নং বংকিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২"—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।**

২। **শিশুসাথীর বর্ষ বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়।** যে কোন সময়ে টাকা পাঠাইয়া বৈশাখ অথবা অন্য যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। কোন্ সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইবেন, মনি-অর্ডার কুপনে বা পত্রে তাহা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। **পত্রিকার মোড়কে হাতে লেখা গ্রাহক-নম্বর দেওয়া থাকে।** পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা নম্বর গ্রাহক নম্বর নহে।

৪। প্রতি মাসের ১লা তারিখের মধ্যেই সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকার পত্রিকা ডাকে পাঠান হয় ১০ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা কারণ লিখাইয়া ১৫ই তারিখের মধ্যে চিঠি লিখিলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান হয়। দুই এক মাস পরে জানাইলে পত্রিকা পাঠান হয় না।

৫। বেশির ভাগ সংখ্যা যদি হারাইয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি সংখ্যার জন্য ·৫০ নয়া পয়সা হিসাবে মূল্য ও রেজেষ্ট্রী করিবার খরচ মনি-অর্ডার কুপন পাঠাইয়া রেজিষ্টার্ড পোষ্টে পাঠান হইবে কাহাকেও একই সংখ্যা বার বার পাঠান হয় না।

৬। গ্রাহকেরা প্রত্যেক চিঠি-পত্রে **নাম, পূর্ণ ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর অবশ্য উল্লেখ করিবেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। **লেখক-লেখিকা এবং গ্রাহক-গ্রাহিকাদের** লেখা, তাঁহাদের তোলা ফটো এবং আঁকা ছবি সম্পাদিকার মনোনীত হইলে প্রকাশ করা হয়; তবে যে-কোন লেখা বা ছবি কোন্ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে, তাহা বলা একেবারেই সম্ভব নয়। **লেখা বা ছবির সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট না পাঠাইলে ফলাফল জানান হয় না। লেখা সর্ব্বদা নকল রাখিয়া পাঠান দরকার** কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। **কবিতা ফেরত দিবার ব্যবস্থা নাই।** যে-কোন লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং খামের উপর বিভাগের নাম লিখিয়া দিলে সুবিধা হইবে। "শিশুসাথী" সম্বন্ধে যে-কোন বিষয় জানিতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাক-টিকেট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

কর্মাধ্যক্ষ, **'শিশুসাথী'**; ৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

ফোন : ৩৪-১৫৬৪

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

শিশু সাথী

(সচিত্র মাসিক পত্র)

৪৫শ বর্ষ

১৩৭৩

আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

(বর্ণানুক্রমিক)

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	অ	
অন্ধকারে জলার ধারে	সুবীর চট্টোপাধ্যায়	২৬
অমিয় বনাম বিজন	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৭২
অমৃত সরোবর ও স্বর্ণমন্দির	শ্রীসুলেখা চক্রবর্ত্তী	৫৬০
	আ	
আজব ফলের মেলা (কবিতা)	শ্রীহরিবিষ্ণু সরকার	২৩
আবাহন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১
আমন্ত্রণ (কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া	৫৩৭
আমাদের পানীয়—কফি	শ্রীঅমরনাথ রায়	৭১৬
আমি আমার কর্তব্য করেছি	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত	১৪১
আরও কি কি খাওয়া চাই	ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য	৪৮০
	ই	
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি	শ্রীঅতসি সেন	৩৬৭
	উ	
উত্তরদাতাদের নাম		২০৪, ২৪৭, ৩৩৮, ৪০৩, ৫৩৫, ৫৯২, ৭২৬, ৭৮৬
উত্তরাধিকার		২২৯, ৩১৭, ৩৭২, ৪৬২
উত্তুরে বাতাসের গল্প	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৬২১
উল্কা	শ্রীসুখরঞ্জন রায়	৪৯১
	এ	
এই আশ্বিনে (কবিতা)	শ্রীঅতীন মজুমদার	৩৪১
একজন চালাকের গল্প	ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী	৯৩
একটা কিছু কর (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	২৭৭
একটি অধ্যায়ের কাহিনী	শ্রীসাবিত্রী সেনগুপ্তা	৬১০
একটি প্রতিভা	শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস	১০১
একমুঠো (কবিতা)	শ্রীপরিচয় গুপ্ত	৫৭৪

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
এ কালের ছড়া (কবিতা)	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়	২৭৮
এমো	শ্রীবসন্তকুমার কবিরাজ	৪৯৮
	ক	
কঠিনে-কোমলে	শ্রীবারীন মৈত্র	৪২১
কবিতাবলী (কবিতা)	শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	২২১
কবিতার ধাঁধা	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	১৩৭, ৫৩৪
কলকাতার বর্ষায় ভানি (কবিতা)	শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়	২৩২
কার্টুন	শতদল	১৯০
কাঁঠাল পাখী	বি. দে	৩৯০
কানে তুলোর দেশে	শ্রীশিশির মজুমদার	৩০২
কুপকুপ	শ্রীগৌরী চৌধুরী	১৫, ৮০, ১৬৩, ২৩৩, ২৭৯, ৩৬৩, ৪৯৪, ৫৩৮, ৫৯৯, ৬১৮, ৭৩০
কুয়েলালামপুরের ডলার পোড়ানোর যাদু	যাদুকর এ. সি. সরকার	১২০
কেম্ব্রিজের দড়ির ম্যাজিক	যাদুকর এ. সি. সরকার	৪৬০
কৃতজ্ঞতা (কবিতা)	শ্রীদেবকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৪২
ক্ষমা চাই না	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১০
	খ	
খুকুর মাষ্টারি (কবিতা)	শ্রীকার্তিক ঘোষ	৬৫৩
খেঁকি	মুরারীমোহন বিট	৪৪৭
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৬৭, ১৩৫, ২০১, ২৭৩, ৩৩৬, ৪০১, ৪৬৬, ৫৩৩, ৫৯০, ৬৫৬, ৭২৪, ৭৮৩
খোকা আর খুকু (কবিতা)	শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	৭২০
খোকা-পালোয়ান	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ	৫১৯
খোকা যাবে চাঁদের দেশে (কবিতা)	শ্রীসরল দে	১৬২
	গ	
গত মাসের ধাঁধার উত্তর		৫০, ২০৪, ২৪৭, ৩৩৮, ৪০৩, ৫৯২, ৭২৬, ৭৮৬

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠ
ঘ		
ঘুড়ি যদি আটকায় (ছড়া)	শতদল	৪১২
চ		
চড়াইকে : খুকু (কবিতা)	শ্রীকার্তিক ঘোষ	৭৩৪
চন্দ্রকেতু গড়	শ্রীশান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫৮
ছ		
ছড়া		
আর কেঁদো না	শ্রীরথীন সরকার	২৪২
চড়ুইয়ের সাজা	শ্রীবরেন রায়	৩১৮
ছড়া	শ্রীমতী	৪৬
ছড়া	শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩১৮
ছড়া	শ্রীঅমিতাভ গুপ্ত	৩৭৩
ছড়া	শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত	৬৩৫
ছড়া	শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়	৭০৬
বোম্বেটে	শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত	১৮২
ল্যাংতুয়া	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু	৩৭৩
হাট্টিমা টিম পাখী	সাজ্‌জাদ উদ্‌দীন আহ্‌মদ	১১৩
ঢাক গুড়গুড়	শ্রীসরল দে	৭৬৯
যা কবিতা মিলে যা	শ্রীশৈলশেখর মিত্র	৭৬৯
ছবির ধাঁধা		৬৬
ছেলেবেলার অভেদানন্দ	সন্ন্যাসিনী যোগদাপুরী	৪৩৪
জ		
জন্ম যদি (কবিতা)	শ্রীবরুণ বিশ্বাস	৫৮৬
জলের ম্যাজিক	যাদুকর এ. সি. সরকার	৩২৭
জষ্টি এল (কবিতা)	শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ	৭১
জাতক কাহিনী	জয়ন্তী সেন	৪২
জাপানের চিঠি	পি. সি. সরকার	৫৬, ১১০, ১৮৫, ৬১৮
জীবজগতের বুদ্ধিবৃত্তি	শ্রীঅতসি সেন	৭৬৩
ট		
টুনটুনি (কবিতা)	শ্রীহিমকর গোস্বামী	৭৫৪

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ড	
ডানপিটে বিবেকানন্দ	শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৯৬
ডিটেকটিভ রতন-হিতেনের কীর্তি	শ্রীপরিমল গোস্বামী	৫১
ড্রাগন বধ	শ্রীহরিবিষ্ণু সরকার	৬৫০
	ত	
তিন পুতুলের ছড়া (ছড়া)	কার্ত্তিক ঘোষ	৪১১
তিব্বতের কথা	শ্রীসঞ্জীবকুমার নন্দী	২৬৮
তেনালিরামের তামাশা	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	৭১৭
তেলের তালিকা (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬২
তোমরাও করতে পারো	শ্রীসুনীল সরকার	২৩০
তোমাদের পাতা		
আগমনী (কবিতা)	শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু	৩৭৪
আদ্যিকালের বদ্যিমশাই (কবিতা)	শ্রীকেয়া বসু	৩৭৮
আমি কবি (কবিতা)	শ্রীঅমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়	২৪৫
ঋতু হেমন্ত (কবিতা)	লুৎফর রহমান খান্	৫৭৭
এক রাতের ভূত	করবী গুপ্ত	১১৪
এসেছে পৌষ-পার্বণ (কবিতা)	শ্রীসুভাষকুমার মণ্ডল	৬২৭
কিশোর (কবিতা)	শ্রীচন্দ্রশেখর গোস্বামী	৩২২
খুকুর বায়না (কবিতা)	শ্রীরণিতা ঘোষ	৭০৯
জন্মদিন	কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়	৪৯
জিভকাটা চড়ুইটি	ছন্দা দিন্দা	১১৮
ঝগড়া করতে নেই	শ্রীবলীন্দ্রকুমার বৈদ্য	৭০৭
তাঁতি-বৌ	জবা গুপ্তা	৫১৩
দি ক্লোক	শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত	২৪৩
দি বেট	শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত	৪৭
দুঃখ	শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত	৫৭৫
নববর্ষে (কবিতা)	স্বরূপকান্তি মুখোপাধ্যায়	৪৯
নবীন সাথী (কবিতা)	শ্রীপঞ্চানন মালাকার	১৮৪
পার্থসারথি স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা	শ্রীচন্দন দাশগুপ্ত	৭৭১
বর্ষাদিদি (কবিতা)	শ্রীমণিকা মৈত্র	২৪৬
বাপ ও ছেলে (কবিতা)	আবৃতুল্লাহ্-আল্-হাসান	৫১৫
ভোর হয়েছে (কবিতা)	মৃগেন্দ্রকুমার বেরা	১১৭
রাজামশাই (কবিতা)	শ্রীরানু সাহা	১৮৩

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
শিল্পনগর দুর্গাপুরে আমরা	শ্রীজয়ন্তী রায় চৌধুরী	৩১৫
শিশু-সাথী (কবিতা)	মহম্মদ রায়হান আলী খাঁন	৭১০
শ্রদ্ধাঞ্জলি	শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু	৩১৯
সমব্যথী	শ্রীউৎপল সান্যাল	৬৩৬
হাতীর লড়াই	শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১০
	দ	
দামাল হাওয়ার রাতে (কবিতা)	শ্রীশোভাময় নাথ	৩৫২
দীপান্বিতায় (কবিতা)	শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯০
দীপান্বিতা রাতে (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৪৪২
দেবেশ্বরের মুক্তিলাভ	শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম	২২২
	ন	
নতুন ধাঁধা	শ্রীচারু খাঁ	২০৩
নতুন ধাঁধা	শ্রীবিনয় বাগচী	২৭৪, ৫৯২
নতুন ধাঁধা		৩৩৮
নতুন ধাঁধা	সুভাষ মণ্ডল ও বিচিত্র গুহ	৪০৩
নতুন ধাঁধা	শ্রীমলয়বিজন ভট্টাচার্য	৬৫৮
নতুন ধাঁধা	শ্রীআশিসকুমার ভূঞ্যা	৭২৬
নতুন ধাঁধা	শ্রীঅবিনাশ চৌধুরী	৭৮৬
নতুন বছরে (কবিতা)	শ্রীঅতীন মজুমদার	১০৯
নাচব-হাসব-বাঁচব (কবিতা)	শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৬১৭
নানা কথা	অমিতাভ চক্রবর্তী	৬৪
নেপালমামার ঘুম	শ্রীবেলা দেবী	৭১৩
	প	
পশুশালা (কবিতা)	শ্রীসুধীর গুপ্ত	৪৯৩
পিরামিডের গল্প	শ্রীসলিল সরকার	৬৮২
পিরামিডের রাণী	শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৩৬০
পীতাম্বর সার্কাস পার্টি	শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	৭৭৩
পেনাং শহরের সুপারীর যাদু	যাদুকর এ, সি. সরকার	৭৭৭
পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম		৬৫৯
প্যারিস শহরে এক বন্ধুর ফ্লাটে	যাদুকর এ. সি. সরকার	২৫৯
প্রায়শ্চিত্ত	শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী	২৬২

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ফ	
ফাল্গুন (কবিতা)	শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী	৬৬৩
ফুলরাণী	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৫৩
	ব	
বইয়ের ঝুলি		৪০২
বকুল ফুলে ম্যাজিক	যাদুকর এ. সি. সরকার	৫১৭
বজ্রানন্দ	ভৈরবপ্রসাদ হালদার	৪২৬
বড়দের কথা	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	২৬৪
বদনের বাগান	স্বপনবুড়ো	৫০৮
বরফের দেশ	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	৩৪, ১০৪, ১৫৩, ২০৯, ৩২৩, ৩৪২, ৫০০, ৫৬৩, ৬০৪, ৬৯৪
বর্ষা (কবিতা)	শ্রীআশানন্দন চট্টরাজ	১৪০
বর্ষার পল্লী (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৬১
বর্ষার রূপ (কবিতা)	শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৯
বসন্ত এসেছে (কবিতা)	শ্রীবাউল দাশ	৭২৯
বাঘবন্দী (কার্টুন)	চণ্ডী লাহিড়ী	৪০৮
বাড়ীগুলো যদি গাড়ী হতো (কবিতা)	শ্রীশান্তশীল দাশ	৭২৭
বাতাসের খেলা	শ্রীমলয়কুমার সরকার	৬৪৯
বিজ্ঞান-পত্র	সঞ্জয়	৫৯, ১৩০, ২৪৮, ৩৩১, ৩৭৯, ৪৬৩, ৫২৮, ৫৬৯, ৬২৫, ৬৯৯, ৭৭৯
বিজ্ঞানের খেলা	শ্রীগজেন্দ্রকুমার দেব রায়	৩৪৮
বিদেশী গল্পগুচ্ছ	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা	৩, ১২২, ১৯১, ২৫১, ২৮৬, ৩৮০, ৫৫২, ৬৬৪
বিদ্যাদেবী (কবিতা)	শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ	৭২০
বিস্ময়	শ্রীরমেন দাস	৪৬৫
বুদ্ধির ঢেঁকি বোকারাম	শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়	১৭৩
বুদ্বুদের বড়াই	শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭২
বৈশাখ মাসের ছবির ধাঁধার উত্তর		২০৪
বৈশাখ মাসের ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফল		২০৪

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
বোকাও চালাক হয়	ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৭০২
ব্যাঙ্ আর রুপালি পাতা	শ্রীমুরারিমোহন বিট	৬৪০
ব্যাঙ্কক যাবার পথে রেলের কামরায়	যাদুকর এ সি. সরকার	১৮০
	ভ	
ভবা পাগলা	শ্রীমোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৫
ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক	অমরনাথ রায়	২৪
ভৌতিক বাক্সের খেলা	যাদুকর বি. দাস	৫৮৮
	ম	
মহারাজ ও বাঘ	শ্রীহরিপদ রায়	৬৭২, ৭৪৯
মহারাজার দান (কবিতা)	শ্রীনীলরতন দাশ	৬০৩
মহিষাসুর বধ	শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী	৪০৭
মহীয়সী নারী	শ্রীসতীরাম বিশ্বাস	৩২৮
মাতৃ-ভক্তি (কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	৭৮
মানুষের বুদ্ধিকেও হার মানায়	শ্রীসুনীল সরকার	৭৫৫
মিথ্যে শিকারের সত্যি গল্প	শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম	৪৮৫
মুক্তো চুরির রহস্য	শ্রীঅতীন মজুমদার	৭৬০
মুস্কিল আসান	শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা	৫৪৬
মেকি	আগন্তুক	৩৯৭
মেঠো কাহিনী	গৌরী চৌধুরী	৪১৩
	য	
যাঁকে নিয়ে বড়দিন	শ্রীঅতীন মজুমদার	৫৪৩
যাদুকর	স্বপনবুড়ো	৬৮৪, ৭৩৫
যাদুকরের দুর্গে	শ্রীঅমিতাকুমারী বসু	৫৭৭
যে ব্যাঙ্কে টাকা নেই, জীবন আছে	ননীগোপাল চক্রবর্তী	৪৪৩
	র	
রকেটের কথা	শ্রীমানবেন্দ্র নাগ	৫৮৭
রক্তারক্তি	শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়	২৬০
রামধনু (কবিতা)	শ্রীসুধীর গুপ্ত	২৭০
রেঙ্গুনে একদিন সন্ধ্যায়	যাদুকর এ. সি. সরকার	৪০
রোদের ছড়া (ছড়া)	শ্রীঅনুপম দত্ত	৫৯৮

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
	ল	
লবণাক্ত	শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায়	২৮৩
লাডাক	শ্রীঅনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৭
লিমেরিক (কবিতা)	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	৩৩০
লিমেরিক (কবিতা)	সুনন্দা দাশগুপ্ত	৪১০
লেখন (কবিতা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৭
	শ	
শয়তানের থাবা	শ্রীচিত্ত ঘোষাল	২৯৬
শরৎ-ছন্দ (কবিতা)	রেবতীভূষণ ঘোষ	৪০৬
শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	৬২, ১৩৩, ১৯৯, ২৭১, ৩৩৪, ৩৯৪, ৫৩১, ৫৮৯, ৬৫৪, ৭২১, ৭৮১
শান্তিনিকেতনে ছোটদের রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	শ্রীঅনিলেন্দু চক্রবর্তী	২৬৭
শিবাজীর মহানুভবতা (কবিতা)	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	২৯৪
শিশুসাথী (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪০৫
শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ	শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৫০৫
শীত-সকালের রোদ (কবিতা)	শ্রীঅমলেন্দু দত্ত	৪৬৯
শীতের প্রাতে (কবিতা)	শ্রীবাউল দাশ	৫৯৫
শেষ পর্যন্ত	শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম	৬১৩
	স	
সজারু	শ্রীবিজয়গোপাল বসু	২২৭
সঙ্গীতজ্ঞদের উদ্ভট পরিকল্পনা	শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য	১৭২
সম্পাদিকার চিঠি		৬৯, ১৩৮, ২০৫, ২৭৫, ৩৩৯, ৪০৪, ৪৬৮, ৫৯৩, ৬৬০, ৭২৭, ৭৮৭
সাগরের নীচে যা আছে	শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়	৭৭
সাপের মুকুট	রাজলক্ষ্মী দাশগুপ্ত	৪৩৭
সিঙ্গাপুরের উড়ন্ত ডিম	যাদুরত্নাকর এ. সি. সরকার	৩৮৮
সোনালী গাছের সোনালী পাখী	শ্রীমনোরম গুহ-ঠাকুরতা	৪৭০
সোনালী নদীর দেশে	ডাঃ কল্যাণী প্রামাণিক	৪৫৩
সৌদী আরবের রীতিনীতি	শ্রীঅমিতাকুমারী বসু	১২

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃ
হ		
হংকংএ এক শিশু-মজলিসে	যাদুকর এ. সি. সরকার	৭১১
হংকং-এর ক্যাথে ক্লাবে	যাদুকর এ. সি সরকার	৬৩৮
হাত তোলো—কে তুমি ?	শ্রীঅনন্ত সিংহ	৬২৮
হানা (কবিতা)	শ্রীমতী বাণী রায়	৪২৹
হার (কবিতা)	শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ	৫৫৯
হারানো নাম	শ্রীমাধব পাল	৫৮৫
হাসির দেশ (কবিতা)	শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত	৫৪৫
হিং টিং ছট্	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু	৭৪৹
হীরকের কথা	শ্রীজ্যোতির্ময় হুই	৭৫৮
হে কবি জ্যোতির্ময় (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	১৪

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক সমগ্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

৪৫শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

প্রতিষ্ঠিত বাং ১৩২৯ সাল ; ইং ১৯২২ সন

শিশু সাথী

বৈশাখ
১৩৭৩

বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ৫০ পয়সা

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	আবাহন (কবিতা)	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	১
২।	বিদেশী গল্পগুচ্ছ	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা	৩
৩।	সৌদী আরবের রীতিনীতি	শ্রীঅমিতাকুমারী বসু	১২
৪।	হে কবি জ্যোতির্ময় (কবিতা)	শান্তশীল দাশ	১৪
৫।	কুপকুপ	গৌরী চৌধুরী	১৫
৬।	আজব ফলের মেলা (কবিতা)	হরিবিষ্ণু সরকার	২৩

খোকনের জন্য

শিশুর কোমল ত্বক, ঘামাচি, চুলকনা প্রভৃতি চর্ম রোগের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য 'পার্ল পাউডার' অদ্বিতীয়। ইহার স্নিগ্ধ সুগন্ধ, সুক্ষ্ম রেণু খোকনের গা কোমল ও মসৃণ রাখবে এবং তা'র মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

পার্ল পাউডার

পরাগকোমল
প্রসাধন রেণু
শিশুদের কোমল
ত্বকের জন্য

বেঙ্গল কেমিক্যাল কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৭।	ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক	অমরনাথ রায়	২৪
৮।	অন্ধকারে জলার ধারে	সুবীর চট্টোপাধ্যায়	২৬
৯।	বরফের দেশ	শ্রীভৈরবপ্রসাদ হালদার	৩৪
১০।	রেঙ্গুনে একদিন সন্ধ্যায়	যাদুকর এ. সি. সরকার	৪০
১১।	জাতক কাহিনী	জয়ন্তী সেন	৪২
১২।	ছড়া		
	ছড়া	শ্রীমতী	৪৬
১৩।	তোমাদের পাতা		
	(১) দি বেট	পার্থসারথি গুপ্ত	৪৭
	(২) নববর্ষে (কবিতা)	স্বরূপকান্তি মুখোপাধ্যায়	৪৯
	(৩) জন্মদিন	কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়	৪৯

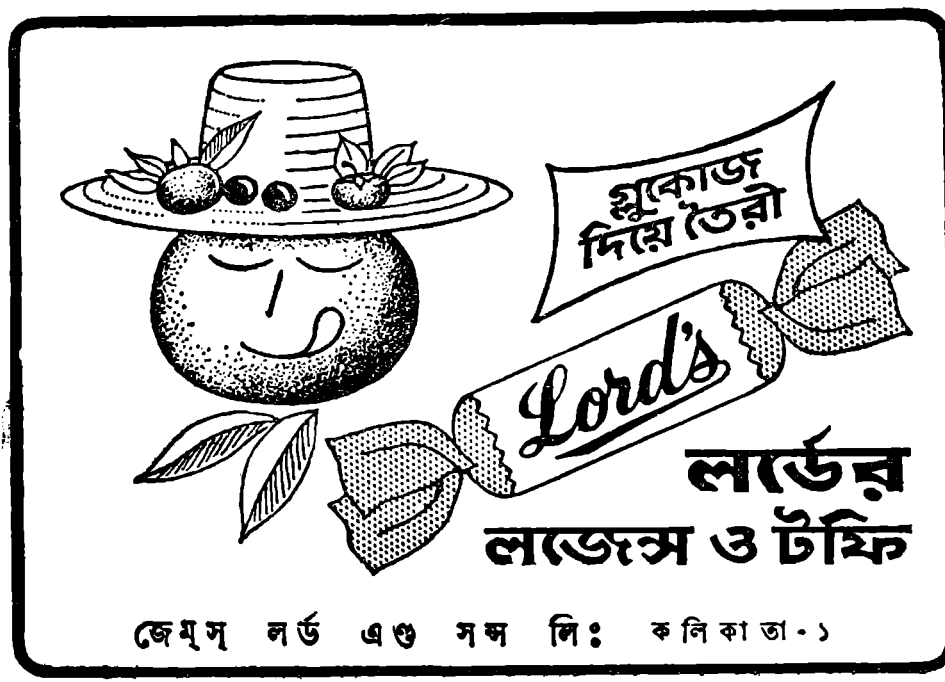

সূচী

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১৪।	গত মাসের ধাঁধার উত্তর		৫০
১৫।	ডিটেকটিভ রতন-হিতেনের কীর্তি	পরিমল গোস্বামী	৫১
১৬।	জাপানের চিঠি	পি. সি সরকার	৫৬
১৭।	বিজ্ঞান-পত্র	সঞ্জয়	৫৯
১৮।	শরীরচর্চার বৈঠক	বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়	৬২
১৯।	নানা কথা	অমিতাভ চক্রবর্তী	৬৪
২০।	ছবির ধাঁধা		৬৬
২১।	খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	৬৭
২২।	সম্পাদিকার চিঠি		৬৯

শিশু সাহিত্যে উপাচার

খেলার সাথী ঃ রূপকথা আর বিজ্ঞানের সমন্বয়ে এই রঙীন রামধনুর কল্পনা করেছেন স্বপনবুড়ো আর রূপদান করেছেন শিল্পী শ্রীসমর দে বহু রঙীন ছবি দিয়ে। [২·৫০]

ছবির খেলা ১ ঃ বাদল সরকার রচিত ও চিত্রিত এই বইটিকে বুদ্ধির খেলাও বলা চলে। পাতায় পাতায় ছবি ও ছড়া দিয়ে ধাঁধা। [২·০০]

ছোটদের ছড়া-সঞ্চয়ন ঃ মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রভাত বসু সঙ্কলিত ও সমর দে চিত্রিত প্রাচীন ও আধুনিক ছড়ার সুষ্ঠু সংগ্রহ। [২·৫০]

শ্যামলা-দীঘির ঈশান-কোণে ঃ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত শ্রীসূর্য্য রায় চিত্রিত সরস ছন্দে একটি সুখদুঃখে ভরা মিষ্টি কাহিনী। [২·৫০]

ছেলেবেলার বিবেকানন্দ ঃ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত ও শ্রীপ্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রিত বিবেকানন্দের ছেলেবেলার কাহিনী। [২·০০]

নবীন রবির আলো ঃ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য রচিত ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী চিত্রিত রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কাহিনী। [১·৭৫]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিকাতা-৯

আমি,
তুতুল,
দিপু-

আমাদের সকলেরই ভালো লাগে—

মার্গো সোপ এর প্রচুর নরম ফেনা কোমল চামড়ার পক্ষে সত্যিই খুব ভাল।

নিম টুথ পেষ্ট ব্যবহারে দাঁত ঝক্‌ঝকে ও মাড়ী শক্ত হয় এবং দাঁতের অসুখ হয় না।

ক্যাষ্টরল মাথায় মেখে স্নান করলে কি আরাম। তাছাড়া মাথায় কত চুল হয়।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

(ইং ১৯১৩ সালে গৃহীত ফটো—এই বৎসর কবিবর 'নোবেল' প্রাইজ লাভ করেন।)

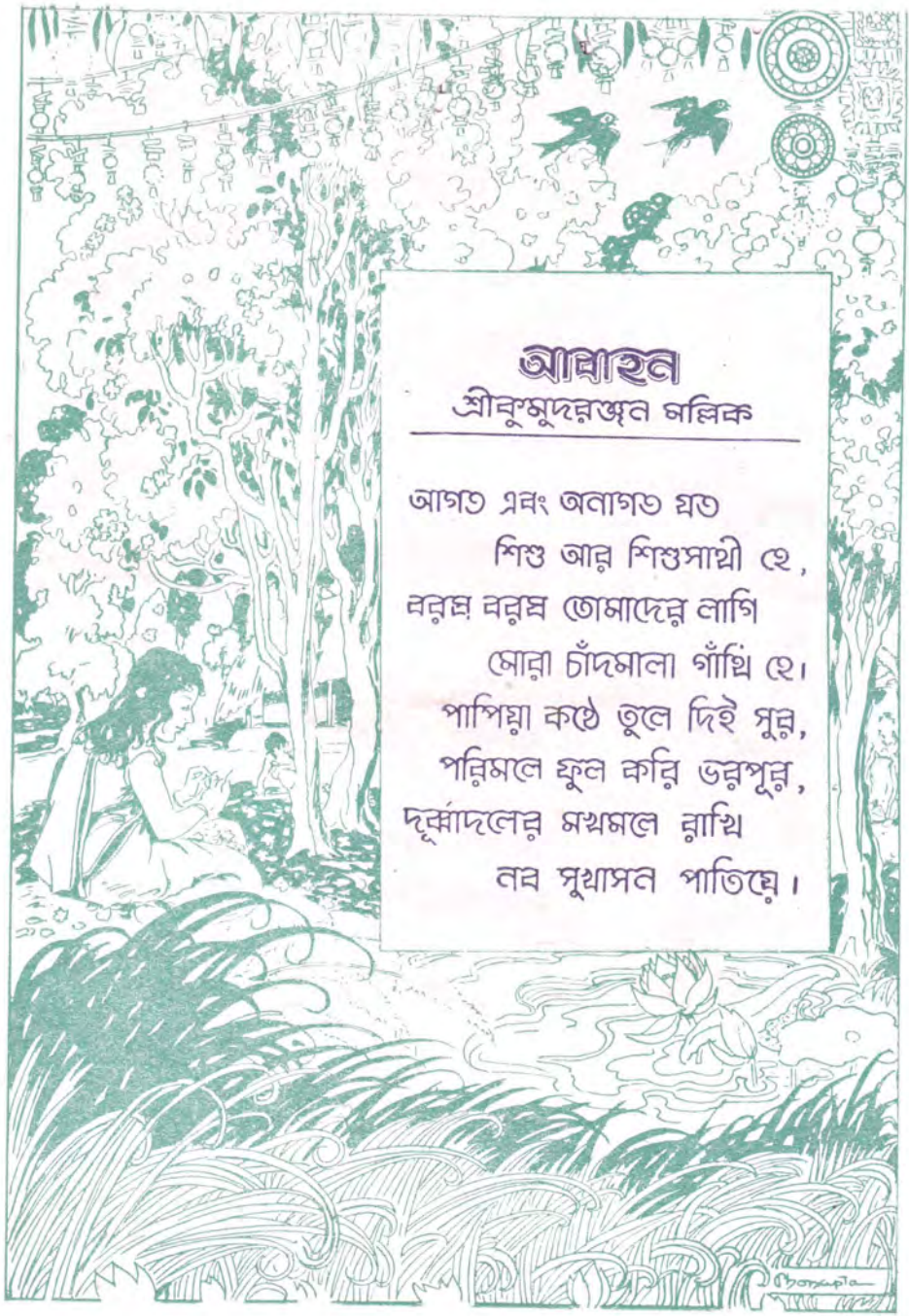

আবাহন

শ্রীবুদ্ধদেবরঞ্জন মল্লিক

আগত এবং অনাগত যত
শিশু আর শিশুসাথী হে,
বরণ বরণ তোমাদের লাগি
মোরা চাঁদমালা গাঁথি হে।
পাপিয়া কণ্ঠে তুলে দিই সুর,
পরিমলে ফুল করি ভরপুর,
দূর্ব্বাদলের সখমলে রাখি
নব সুখাসন পাতিয়ে।

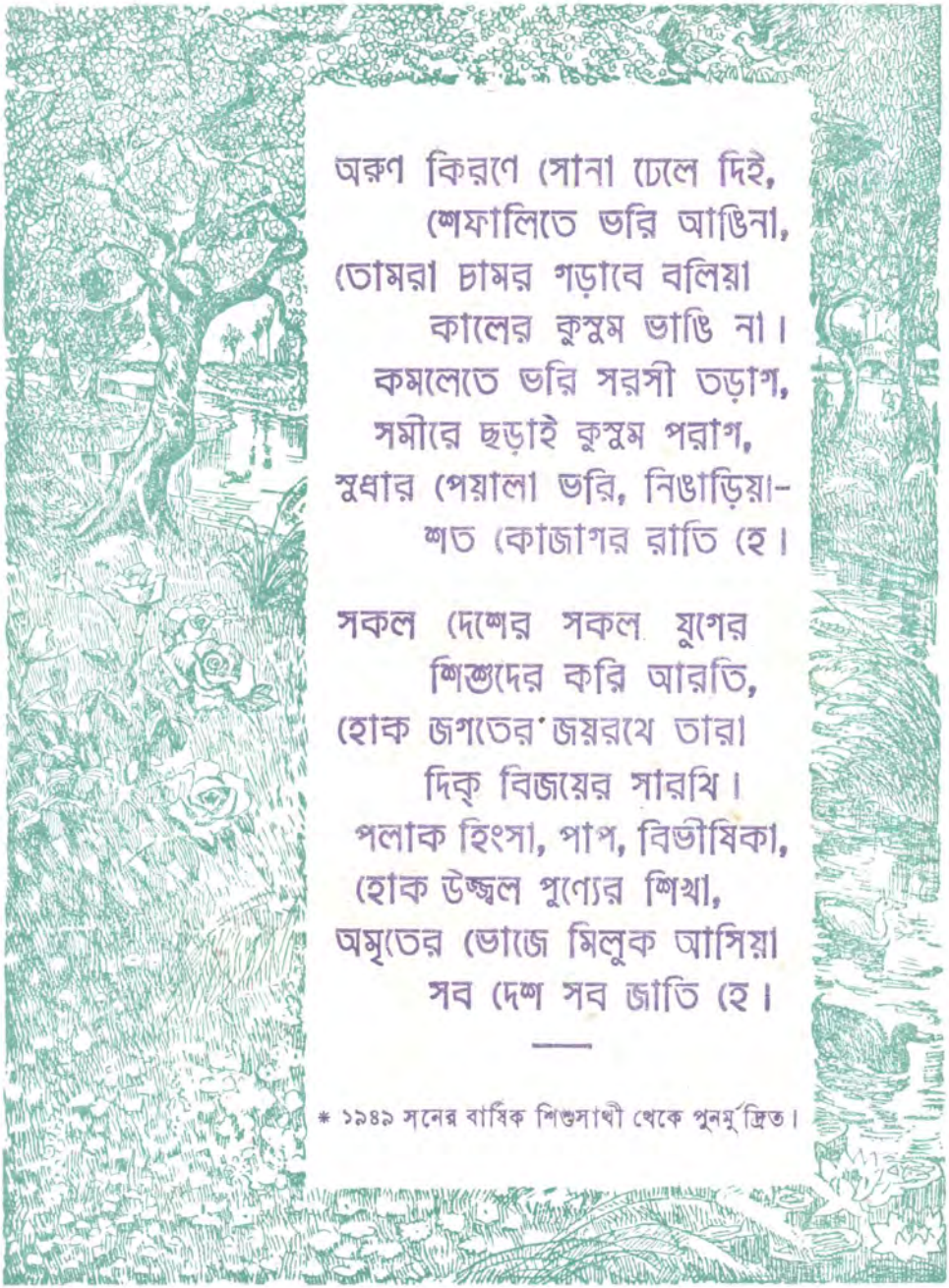

অরুণ কিরণে সোনা ঢেলে দিই,
শেফালিতে ভরি আঙিনা,
তোমরা চামর গড়াবে বলিয়া
কালের কুসুম ভাঙি না।
কমলেতে ভরি সরসী তড়াগ,
সমীরে ছড়াই কুসুম পরাগ,
সুধার পেয়ালা ভরি, নিঙাড়িয়া-
শত কোজাগর রাতি হে।

সকল দেশের সকল যুগের
শিশুদের করি আরতি,
হোক জগতের জয়রথে তারা
দিক্ বিজয়ের সারথি।
পলাক হিংসা, পাপ, বিভীষিকা,
হোক উজ্জ্বল পুণ্যের শিখা,
অমৃতের ভোজে মিলুক আসিয়া
সব দেশ সব জাতি হে।

---

* ১৯৪৯ সনের বার্ষিক শিশুসাথী থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বিদেশী গল্পগুচ্ছ

(১) কাউণ্ট লিও টলস্টয়

॥ মনোরম গুহ-ঠাকুরতা ॥

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা, তখন রাশিয়ার কোন এক গাঁয়ে এক কৃষক থাকতো। তার ছিলো দুটি মেয়ে। কৃষক দুটি মেয়েরই বিয়ে দিয়েছিলো। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো এক সওদাগরের সাথে। বেশ ভালো অবস্থা তার। আর ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছিলো এক কৃষকের সাথে। তারা গাঁয়ে থাকতো।

একদিন শহরের বোন গাঁয়ের বোনের বাড়ীতে বেড়াতে এলো। দু'বোনে অনেক কথাবার্ত্তা হোলো। বড় বোন ছোট বোনকে বললো—তোমরা গাঁয়ে থেকে একেবারেই গেঁয়ো হয়ে গেছো, ছেলে-পুলেগুলো তোমার কেমন নোংরা থাকে। আর দেখ তো আমার ছেলেমেয়েরা কেমন ফিটফাট।

ছোট বোন বললো —আমরা গাঁয়েই বেশ ভালো আছি। শহরের জীবন অত্যন্ত কলুষিত। কত প্রলোভন রয়েছে সেখানে। স্ত্রীপুরুষ সবারই সেখানে অধঃপতনের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এই জীবনই আমাদের ভালো।

ছোট বোনের স্বামী প্যাহোম বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু' বোনের কথাবার্ত্তা শুনলো। সে ভাবলো যে তার স্ত্রী তো ঠিক কথাই বলেছে। সে আরও ভাবলো যে আমাদের জমির পরিমাণ ত কম। যদি আরও কিছু জমি আমাদের থাকতো

তবে গ্রামেই আমরা খুব সুখে থাকতে পারতাম। আমি নিজে খেটে জমিতে সোনার ফসল ফলিয়ে আমাদের অবস্থা ভালো করতে পারতাম। এই থেকেই তার জমি বাড়াবার নেশা সুরু হোলো।

ঐ গাঁয়ের পাশেই এক ধনী মহিলা থাকতেন। তাঁর অনেক জমি ছিলো। তিনি কৃষকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর কাজ দেখবার জন্য একজন ম্যানেজার রাখলেন। সে লোকটা কিন্তু ভালো ছিলো না। সে কথায় কথায় চাষীদের জরিমানা করতো।

মাঝে মাঝে প্যাহোমের গরুবাছুর ঐ মহিলার ক্ষেতে ঢুকে ফসল খেয়ে ফেলতো। এজন্য ম্যানেজার গরুগুলো ধরে খোয়াড়ে দিতো। জরিমানা দিয়ে প্যাহোমকে গরুবাছুর খালাস করে আনতে হোতো। এজন্য খুব ক্ষতি হোতো তার।

প্যাহোম গরুগুলো আর ছাড়তো না; গোয়ালেই বন্ধ করে রাখতো। ওদের খাবার যোগাতে তার খুব কষ্ট হোতো। তা হলেও সে ঝগড়ার ভয়ে গরুগুলোকে আটকে রাখতো।

প্যাহোম শুনলো যে ঐ ভদ্রমহিলা তাঁর জমি বিক্রী করবেন। বাইরের কোনো লোক যাতে জমি না কিনতে পারে, এজন্য গাঁয়ের লোকেরা ঠিক করলো, তারা সবাই মিলে ভাগ করে ঐ জমি কিনে নেবে। কারণ বাইরের কেউ জমি কিনলে তাদের অসুবিধা হবে।

প্যাহোমও কিছু জমি কিনবে ঠিক করলো। তার টাকা ছিলো না, অনেক কষ্টে ধার করে ও অন্য ভাবে টাকা যোগাড় করে সে চল্লিশ একর জমি কিনে নিলো। প্যাহোম এখন নিজেই অনেক জমির মালিক হোলো। সে নিজে কঠোর পরিশ্রম করে ক্ষেতে প্রচুর শস্য ফলালো। তার অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়ে গেলো।

প্যাহোম নিজে ভালো মানুষ হলেও তার প্রতিবেশীরা খুব ভালো ছিলো না। তারা প্যাহোমের জমিতে গরু-ঘোড়া ছেড়ে দিতো। ফলে, তার বহু শস্য নষ্ট হোতো।

প্রথম প্রথম প্যাহোম সবাইকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে গরু-ঘোড়া তার ক্ষেতে না ছাড়বার জন্য অনুরোধ জানালো। এতে তাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া পর্য্যন্ত হোলো। শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়ালো গাছ কাটার এক ব্যাপার নিয়ে।

কে তার জমির ওপর থেকে কয়েকটি ফলবান লাইম গাছ কেটে নিয়ে গিয়েছিলো। সাইমন নামে একজন প্রতিবেশীকে সে সন্দেহ করলো, তার নামেই সে আদালতে নালিশ করলো। কিন্তু প্রমাণের অভাবে বিচারে সাইমনের কোনো শাস্তি হোলো না। এর পর থেকে তার ওপর প্রতিবেশীদের আক্রোশ বেড়ে যেতে লাগলো। তারা প্রতিহিংসার বশে আরও বেশী করে গরু-ঘোড়া তার ক্ষেতে ছেড়ে দিয়ে তার আরও বেশী ক্ষতি করতে সুরু করলো।

প্যাহোম হঠাৎ একদিন শুনলো যে গাঁয়ের অনেকেই জমি বিক্রী করে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। প্যাহোম ভাবলো তা হলে ত বেশ ভালোই হয়। সে আরও জমি কিনে এখানে জমিদার হয়ে

বসবে। একদিন বসে বসে সে এসব কথাই ভাবছে, এমনি সময় তার দেখা হোলো একটি লোকের সাথে। সে বললো যে ভল্‌গা নদীর ওপারে খুব ভালো জমি পাওয়া যায়। সে জমি খুব উর্ব্বরাও। জমির দামও খুব সস্তা। প্যাহোম তার স্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ করলো। স্ত্রীও তাকে সেখানে যাবার জন্য পরামর্শ দিলো। বললো—এখানে অনেক লোক হয়ে গিয়েছে, চলো আমরা ঐ দেশেই যাই।

প্যাহোম জাহাজে উঠে ভল্‌গা নদী পার হয়ে জমি দেখতে গেলো। সেখানে প্রত্যেককে পঁচিশ একর করে জমি দেওয়া হয়। টাকা হলে আরও বেশী জমিও পাওয়া যায়। টাকাপয়সা দিয়ে জমির বন্দোবস্ত করে প্যাহোম দেশে ফিরে এসে তার বাড়ীঘর জমি সব বিক্রী করে ভল্‌গা নদীর ওপারে চলে গেলো সবাইকে নিয়ে। সেখানে জমিতে এত ফসল হতে লাগলো যে তিন-চার বছরের মধ্যেই তার অবস্থা খুব ভালো হয়ে গেলো। সব জমিতে খুব ভালো ফসল হয় না বলে প্যাহোম আরও জমি কিনবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। খুব দুষ্ট লোক না হলে ভালো জমি পাওয়া যায় না। সে এমন এক খণ্ড জমি কিনে বসলো, যা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হোলো। তা সত্ত্বেও কিন্তু তার জমির নেশা কমলো না। সে সেখানে আরও জমি কিনবে ঠিক করলো। একজন লোকের সঙ্গে জমি সম্পর্কে তার যখন কথাবার্ত্তা হচ্ছিলো, তখন আর একজন লোক সেখানে এলো। সে লোকটি বললো—আমি এর মধ্যে এক হাজার রুবলে তেরো হাজার একর জমি কিনেছি।

তার কথা শুনে প্যাহোম অবাক হয়ে গেলো। বললো—কোথায় ভাই, তুমি এত সস্তায় এতগুলো জমি কিনলে?

লোকটি বললো—সে ভাই বাক্‌শীরদের দেশে।

প্যাহোম তাকে জিজ্ঞেস করলো—আরও জমি সেখানে আছে?

লোকটি উত্তর দিলো—প্রচুর জমি সে-দেশে আছে। তুমি যাও না, তুমিও পাবে।

প্যাহোম তাকে জিজ্ঞেস করে, তার থেকে পথের নির্দ্দেশ নিয়ে নিলো।

তারপর আবার তাকে প্রশ্ন করলো—সে দেশে গিয়ে আমায় কি করতে হবে?

লোকটি বললো—কিছুই করতে হবে না, বাক্‌শীরদের খুশী করতে পারলেই হবে। আমি ত ওদের ভালো ভালো জিনিষ উপহার দিয়ে খুশী করে এই জমি পেয়েছি। তুমিও তাই করবে।

প্যাহোম বাক্‌শীরদের উপহার দেওয়ার জন্য কিছু দামী জিনিষ কিনলো। তারপর লোকটির দেওয়া পথের নিশানা ধরে সে চলতে লাগলো। সাত দিন সাত রাত্রি হেঁটে প্যাহোম বাক্‌শীরদের দেশে গিয়ে পৌঁছলো।

সে-দেশে গিয়েই সে বাক্‌শীরদের সর্দ্দারের সাথে দেখা করে তাকে উপহারগুলো দিলো। উপহার পেয়ে সর্দ্দার খুব খুশী হোলো।

তারপর সর্দ্দারের সাথে জমির দাম সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হোলো। সর্দ্দার বললো—আমাদের এখানকার জমির বাঁধা দর। দিনে হাজার রুবল।

প্যাহোম ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। তাই পরিষ্কার করে নেবার জন্য সে তাকে আবার জিজ্ঞেস করলো—ব্যাপারটা ত আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সর্দ্দার জবাব দিলো—শক্ত কিছুই নয়। প্রথম জমিটা দেখে তুমি পছন্দ করবে। তারপর তোমায় সূর্য্যোদয় থেকে সুরু করে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত জমির এক দিক থেকে অপরদিকে যেতে হবে এবং সেখান থেকে জমির সব দিকের সীমানা ঘুরে আবার ঐ জায়গায়ই ফিরে আসতে হবে। এর মধ্যে যতটা জমি পড়বে ততটা জমিই এক হাজার রুবলে পাওয়া যাবে। যদি ঠিক সময়ে ফিরে আসা সম্ভব না হয়, তা হলে সব টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। টাকা আগেই জমা দিতে হবে।

প্যাহোম বললো—সে ত অনেক জমি হবে।

সর্দ্দার বললো—অনেক জমিই তুমি পাবে।

প্যাহোম খুব খুশী হয়ে সর্দ্দারের কাছে এক হাজার রুবল জমা দিলো।

সেই রাত্রে মনের আনন্দে তার ভালো করে ঘুম পর্য্যন্ত হোলো না। ভোর-রাত্রে সে দুঃস্বপ্ন দেখলো। স্বপ্নে সে দেখলো তার জমির নেশা দেখে বাকৃশীররা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। তারপর যে লোকটির সাথে তার এখানকার জমির সম্পর্কে প্রথম আলাপ হয় তাকেও সে স্বপ্নে দেখতে পেলো। সেও তাকে দেখতে পেয়ে হাসতে লাগলো। প্যাহোম এসব দেখে একটু অবাক হোলো। এর মধ্যে তার ঘুম ভেঙে গেলো।

তখন ভোর হয়-হয়। সে বাকৃশীরদের শিবিরে ছুটে গেলো।

বাকৃশীররা তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের মাথায় গেলো। সেখান থেকেই প্যাহোমকে যাত্রা সুরু করতে হবে।

প্যাহোম পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দেখলো, আকাশের পুব দিক লাল হয়ে গেছে। পথ চলবার সময় চিহ্ন রাখবার জন্য একটা ছোট কোদাল সে সঙ্গে নিলো। বোতলে ভরে জল আর একটা কৌটো ভরে খাবার নিলো। সে গা থেকে পুরু জামা খুলে ফেললো। প্যাণ্টের বেল্ট কষে বাঁধলো। তারপর পুব দিক পানে হাঁটতে সুরু করলো। প্রথম সে ধীরে ধীরেই হাঁটতে লাগলো। কতকদূর হেঁটে হেঁটেই পথের ওপর কোদাল দিয়ে মাটি কেটে চিহ্ন রেখে সে এগুতে লাগলো। সে ভাবলো, ভালো করে চিহ্ন রেখে যাওয়া দরকার, কারণ আবার ফিরতে হবে ত। তখন পথ হারিয়ে গেলে অসুবিধা হবে।

ধীরে ধীরে সূর্য্যের তেজ বাড়তে লাগলো। বেলা দুপুর হয়ে গিয়েছিলো। প্যাহোমের ক্ষুধা পেয়েছিলো। খাবারের কৌটো খুলে সে খাবার খেতে সুরু করলো। খাবার সময়ও সে থামলো না। তারপর বোতল থেকে জল পান করলো, তখনও থামলো না—হেঁটেই চললো। তখন তার মনে

হোলো যে সে বহু মাইল হেঁটে এসেছে। সূর্য্য তখন পশ্চিম দিগন্তের আকাশে হেলতে সুরু করেছে। সে ভাবলো যে এখন তার ফিরতে হবে। ফিরে যেতে সময়ও কম লাগবে না।

ফেরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে ঘুরে পাহাড় লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো। যাবার সময় পথে যে সব চিহ্ন সে রেখে গিয়েছিলো, সেই সব চিহ্ন ধরে ধরে এগিয়ে চললো। চলতে চলতে তার পা কেটে গেছে। এদিকে তার বিশ্রাম করবারও ভারী ইচ্ছা হচ্ছিলো। কিন্তু সে তা থেকে বিরত থাকলো। তখন তাকে পুরোপুরি জমির নেশায় পেয়ে বসেছিলো। সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই যেখান থেকে সে যাত্রা সুরু করেছে, সেখানে গিয়ে তাকে পৌঁছতে হবে, নইলে যে সবই নষ্ট হবে। এদিকে ত এখনও বেশ কতকটা পথ তাকে যেতে হবে। সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে অনেক দূর হেলে পড়েছে। প্যাহোম তার চলার গতি বাড়িয়ে দিলো।

হাত থেকে জলের বোতল আর খাবারের কৌটোটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। এখন খালি হাতে সে বেশ জোরে হেঁটে চলছে। শরীর ভীষণ ক্লান্ত, তার গা থেকে মাথা থেকে ঝরঝর করে ঘাম ঝরে পড়ছিলো। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। যে পাহাড় থেকে সে যাত্রা সুরু করেছিলো, এখন সেই পাহাড়টা অতি অস্পষ্টভাবে তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। এবার তার উৎসাহ আরও বেড়ে গেলো। সে আরও জোরে হাঁটতে সুরু করলো, অনেকটা প্রায় দৌড়াবার মতই। এদিকে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে আরও হেলে পড়েছে। সূর্য্যের তেজও অনেকটা কমে এসেছে। তখন তার পা আর চলতে চায় না। তবু সে ছুটতে লাগলো।

সে আরও একটু কাছে যেতেই বাক্‌শীররা তাকে উৎসাহ দিতে সুরু করলো। এবার পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠলো। সে হতাশ হয়ে পড়লো। এতদূর এসেও যদি সে সফল হতে না পারে, তা হলে তার চেয়ে আর দুঃখের কথা কি হবে! তার মাথা তখন ঝিমঝিম করছিলো, হাত-পা অসাড় হয়ে আসছিলো।

তবু সে ছুটতে লাগলো। তখন দুনিয়ার ওপরে অন্ধকার নেমে আসছে। পাহাড়ের ওপার দিয়ে সূর্য্য তখন নীচে নেমে যাচ্ছে। সে যেখান থেকে রওনা হয়েছিলো, ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে পৌঁছলো।

বাক্‌শীররা তাকে অভিনন্দন জানাতে তার কাছে ছুটে এলো। তখন প্যাহোম মাটিতে পড়ে গেছে। তার চোখ গিয়েছে উল্টে। দেহ তার অসাড় নিস্পন্দ।

তার এই অবস্থা দেখে বাক্‌শীররা হায় হায় করে উঠলো।

প্যাহোমের চাকরও সেখানে ছুটে এলো। সে তার মনিবের প্রাণহীন দেহ ওঠাতে গেলো, কিন্তু পারলো না।

তখন সে ছ' ফুট লম্বা একটা কবর খুঁড়ে তার মধ্যে প্যাহোমের দেহ সমাধিস্থ করলো।

প্যাহোম জমির লোভে এ ভাবে প্রাণ দিলো।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্যাহোমের কতটুকু জমি দরকার হোলো? সে ত ঐ ছ' ফুট মাত্র।

তোমাদের কাছে টলস্টয়ের একটি নীতিগল্প বললাম। এ রকম আরও বহু গল্প টলস্টয় লিখেছেন। গল্প ছাড়াও তিনি আরও বহু বই লিখেছেন। তাঁর সাহিত্যিক অবদানের কথা এবার তোমরা শোনো।

বিশ্বসাহিত্যে যাঁরা তাঁদের অপূর্ব্ব সাহিত্য-কীর্ত্তির জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে রাশিয়ার সুবিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক কাউণ্ট লিও টলস্টয়ের নাম রয়েছে প্রথম সারিতে। যতদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যপাঠে মানুষের আকর্ষণ থাকবে ততদিনই পাঠক-সমাজকে টলস্টয়ের রচনা বিশেষ আনন্দ দেবে। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'অ্যানা কারানিনা', 'ওয়ার অ্যাণ্ড পিস', 'ক্রোজার সোনাটা', 'রিজারেকশন' প্রভৃতি বইগুলো। এ ধরণের বই পৃথিবীতে খুব বেশী লেখা হয় নি। মানব-চরিত্রের যে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ তিনি এসব বইয়ে করে গেছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। আজও হয়ত তোমাদের অনেকেরই এসব বই পড়বার মত বয়স হয় নি, কিন্তু বড় হলে তোমরা নিশ্চয়ই এসব বই ও তাঁর অন্যান্য লেখা নিশ্চয়ই পড়বে। তখন দেখবে যে মহৎ সাহিত্যের সমস্ত গুণই এসব বইয়ে রয়েছে। নানা শ্রেণীর মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি মানুষের দুর্ব্বলতা, দোষত্রুটি, মহত্ত্ব সব কিছুই তাঁর দরদী দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে তাঁর সৃষ্ট বইগুলোর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাস ছাড়াও তিনি এমন কতকগুলো নীতিগল্প রচনা করে গেছেন যার মধ্যে রয়েছে এক সার্ব্বজনীন আবেদন। ছেলে বুড়ো কিশোর, মেয়ে পুরুষ, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পরিবেশের মানুষ সবাই একই রকম আগ্রহ নিয়ে এই গল্পগুলো পড়ে যেতে পারে। এইসব গল্পসংগ্রহের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে 'টুয়েনটি থ্রি টেলস' বা তেইশটি গল্প। এসব গল্পে যেসব আদর্শ চরিত্র তিনি সৃষ্টি

করেছেন, যেসব নীতিকে গল্পচ্ছলে তিনি রূপায়িত করে তুলেছেন, সেগুলো পৃথিবীর সব মানুষেরই অনুসরণ-যোগ্য। মানুষ যদি ঐ সব আদর্শে তাদের জীবন এবং তাদের কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে। মানুষের চরিত্রে যে হীনতা, যে নীচতা, যে পরশ্রী-কাতরতা, যে দুর্দ্দমনীয় লোভ বা সম্পত্তির নেশা রয়েছে তা দূর হবে। তোমরা সবাই এ বইখানা পড়ে দেখো। বাংলায়ও এর অনুবাদ আছে।

টলস্টয়ের মানব-প্রেম, দরিদ্রের জন্য সমবেদনা, তাদের দুঃখ মোচনের জন্য আগ্রহ সে-ও আজ প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। তাঁর অপূর্ব্ব মানবতা-বোধ তাঁকে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর মহৎ মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত করেছে। তাঁর নীতি, তাঁর উপদেশ, তাঁর মানবতা-বোধ পৃথিবীর বহু আদর্শবাদী মানুষকে আদর্শের পথে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। মহাত্মা গান্ধী টলস্টয়ের আদর্শের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁর প্রবর্ত্তিত আদর্শ শুধু তাঁর নিজের চরিত্রেই নয়, জাতির চরিত্রেও রূপায়িত করে তুলতে বিশেষভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বনেদী জমিদার বংশে ১৮২৮ সালের ২৮শে আগস্ট টলস্টয়ের জন্ম হয়। দুঃখের কথা বাল্যেই তিনি তাঁর বাবা ও মাকে হারান। অভিভাবকহীন টলস্টয় গৃহ-শিক্ষকের কাছে তাঁর বাল্যের পাঠ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা নীতি তাঁর একেবারেই ভালো লাগেনি বলে তিনি পড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্বগ্রাম ইয়াসেনাইয়া পলিয়ানাতে চলে আসেন। ভেবেছিলেন, বাড়ীতে বসে পড়াশুনো করবেন আর জমিদারী দেখবেন। কিন্তু তাও শেষ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। তাঁর জীবনের এই সময়টা ছিলো একটু জটিল। কোনো কাজে কোথাও স্থির ভাবে তিনি মন বসাতে পারেন নি।

কিছুদিন পরেই হঠাৎ তিনি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। এখানে বিলাস-বহুল জীবন কাটাতে সুরু করেন। মস্কো ও সেন্ট-পিটার্সবার্গের অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকেন। কিছুদিন তিনি সেনা-বিভাগেও কাজ করেন। কৃতিত্বের জন্য চাকুরীতে তাঁর উন্নতিও হয়েছিলো, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন। এই সময়েই টলস্টয় প্রথম উপলব্ধি করেন, যুদ্ধ কত নিষ্ঠুর, কত নির্ম্মম।

টলস্টয় আবার গ্রামে ফিরে আসেন। এবারে তিনি তাঁর জমিদারীর কৃষকদের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি জানতেন, মানুষের ভেতর থেকে অজ্ঞানতা দূর করতে না পারলে, তাদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব নয়। দেশে দ্রুত শিক্ষা বিস্তারের জন্য বয়স্ক শিক্ষারও তিনি ব্যবস্থা করেন এবং নিজে তাদের জন্য বিশেষ ধরণের পাঠ্য বই লেখেন।

চৌত্রিশ বছর বয়সে টলস্টয় রাশিয়ার এক অভিজাত পরিবারের পরমা সুন্দরী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক মহিলাকে বিবাহ করেন। বিবাহিত জীবনের প্রথম পনেরোটি বছর তাঁর খুব শান্তিতেই কাটে। এই সময়েই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানা প্রকাশিত হয়।

অভিজ্ঞতা থেকে টলস্টয়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো যে জন-সমাজের সর্ব্বপ্রকার দুরবস্থার মূলেই রয়েছে শিক্ষাহীনতা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে যারা অমানুষিক পরিশ্রম করে মানুষের জীবনের প্রথম প্রয়োজন খাদ্যের যোগান দেয়, তাদের অবস্থায় পরিবর্ত্তন আনতে না পারলে দেশের কোনো উন্নতিই হবে না। তাই কৃষক-সমাজের মধ্যেই তিনি নানা রকম গঠনমূলক কাজ সুরু করলেন শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে। সব সময়েই তিনি তাদের মধ্যে পড়ে থাকতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবে শিখাইবে' এই নীতি অনুসরণ করে, তিনি তাদের মত পোষাক পরতেন, তাদের সাথে একই টেবিলে বসে একই সাধারণ খাওয়া খেতেন, তিনি নিজেও একেবারে একজন খাঁটি কৃষক হয়ে গেলেন।

ধনীর সন্তান টলস্টয়ের স্ত্রী, তাঁর স্বামীর এ ধরণের জীবনযাত্রা মাত্রই পছন্দ করতেন না। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতদ্বৈধ হয়। যতই দিন যেতে থাকে ততই এ মতদ্বৈধতা বাড়তে থাকে। টলস্টয় কিন্তু তাঁর স্বমতে অবিচলিত থেকে তাঁর কাজ করে যেতে থাকেন। ক্রমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হোলো কলহের সূত্রপাত। টলস্টয় এজন্য সব সময়ই বাড়ী থেকে বাইরে বাইরে থাকতে সুরু করলেন। শেষ পর্য্যন্ত এ ব্যাপারের পরিণতি হোলো ভয়াবহ।

যখন টলস্টয়ের বয়স বিরাশী বছর, তখন একদিন গভীর নিশীথে কাউকে কিছু না বলে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি জীবনব্যাপী যাঁদের ভালোবেসেছেন সেই কৃষকদের মধ্যেই বাকী জীবন শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন।

শীতের রাত্রি। রাশিয়ার ভীষণ শীত এই বিরাশী বছর বয়স্ক বৃদ্ধ সহ্য করতে পারলেন না। পথেই তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। রিয়াজান প্রদেশের এস্টাপোভোতা নামক ছোট্ট একটি রেলওয়ে স্টেশনে গাড়ী থেকে তাঁকে নামিয়ে নেওয়া হোলো। তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন। এই স্টেশনেই তাঁর মৃত্যু হোলো—যাঁদের তিনি চিরজীবন ভালোবেসেছেন সেই কৃষকদেরই মধ্যে। তাঁর মৃত্যুদিন হোলো ১৯১০ সালের ৭ই নভেম্বর।

জীবনের শেষভাগে—দশ থেকে পনেরো বছর পর্য্যন্ত টলস্টয় পৃথিবীতে বোধহয় সব চেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। এই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, এমন কি সুদূর ভারত ও চীন থেকেও বহু মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছেন। ইয়াসেনাইয়া পলিয়ানা তখন যেন এক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিলো।

টলস্টয় বলতেন—যীশুখ্রীষ্ট সত্য সত্যই মহৎ মানুষ ছিলেন। যে শিক্ষা তিনি মানব সমাজকে দিয়ে গেছেন, তা-ও অতি মহৎ। ভগবানের পুত্র বলেই যে তিনি মহৎ ছিলেন, বা তাঁর শিক্ষা মহৎ

ছিলো তা নয়। মানুষের বিবেক এবং বুদ্ধির সাথে এই শিক্ষার সামঞ্জস্য আছে, তাই এই শিক্ষা মহৎ শিক্ষায় পরিণত হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধ এবং মানবজাতির অনেক শিক্ষাগুরুই মানবজাতিকে এইরূপ মহৎ শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তাঁদের শিক্ষাও মানবজাতি একই ভাবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং যীশুখ্রীষ্টের শিক্ষাই যে পৃথিবীতে একমাত্র মহৎ শিক্ষা একথা ভাববার মত কোনো কারণই নেই। এসব হচ্ছে ধর্ম্মযাজকদের প্রচার।

টলস্টয় সমাজ-সংস্কারক বা ধর্ম্ম-সংস্কারক ছিলেন না, এসব সম্পর্কে তিনি কোনো মতও প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তাঁর জীবন-দর্শনের সাথে মানুষের মধ্যে প্রচলিত জীবন-দর্শনের বেশ একটু পার্থক্য ছিলো। টলস্টয় কিন্তু কোথাও তাঁর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে একদল লোক টলস্টয়ের মতের অনুগামী হয়ে তাঁর শিক্ষা মানব-সমাজে প্রচার করেন।

কে সত্যিকার খ্রীষ্টান?—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন যারা অন্যকে শোষণ করে নিজেরা বেঁচে থাকে, বড় হয়, তারা খ্রীষ্টান নামের অযোগ্য। সত্যিকার খ্রীষ্টান হতে হলে তাকে সৎপথে থেকে নিজের পরিশ্রমে নিজেকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে।

তিনি আরও বলে গেছেন, তখনই সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন আনা সম্ভব হবে, যখন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যেকটি মানুষকে ভালবাসবে, হিংসা-দ্বেষ সব কিছু ভুলে যাবে।

টলস্টয়ের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে পৃথিবীর কোথাও আজ আর দ্বিমত নেই, কিন্তু টলস্টয়ের আদর্শবাদ বিশ্বের সর্ব্বসমাজের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি।

টলস্টয়ের ডায়েরী লেখার অভ্যাস জীবনের প্রথম ভাগ থেকেই ছিলো। এই ডায়েরীতে লেখা হতেই সুরু হয় তাঁর প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বহু বই লিখে গিয়েছেন প্রথম জীবন থেকে। সুতরাং সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিরাট। এর পরিমাণ করাও খুব সহজ নয়। সাহিত্যক্ষেত্র থেকে তাঁর নাম কখনও মুছে যাবে না।

সৌদী আরবের রীতিনীতি

॥ শ্রীঅমিতাকুমারী বসু ॥

সৌদী আরবে আমাদের এক বিশিষ্ট বন্ধু কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার সমাজের রীতিনীতি ও চালচলনে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশে ভিন্ন রীতিনীতি ও ভাষা নিয়ে প্রথম প্রথম তাঁকে খুব বিব্রত হয়ে পড়তে হয়েছিল। তিনি তাঁর সে দেশীয় অভিজ্ঞতার নানা প্রকার গল্প বললেন। তাঁর বর্ণিত দু-চারটি ঘটনা সম্বন্ধে তোমাদের লিখছি।

'সৌদী আরবের কথা হয়ত অনেকেই জানে না। একবার আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। এক প্রভাতে আমি সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াধ সহরে অনেকটা প্যারাট্রুপারের মতই হঠাৎ অবতীর্ণ হলাম। আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হোটেলের রুমে ঢুকেই একটা নোটিশ দেখতে পেলাম খাদ্য সম্বন্ধে। তাতে লেখা ছিল—

ব্রেকফাষ্ট—রাত্রি ১টা থেকে ৩টা ৩০ মিঃ
লাঞ্চ—সকাল ৭টা থেকে ৯টা ৩০ মিঃ
ডিনার—বিকাল ২টা থেকে ৪টা

খাদ্যের এরকম বিচিত্র সময় লেখা দেখে বিস্মিত হলাম।

আমাদের প্লেন পৌঁছতে দেরী হওয়ায় আমি ভাবলাম যাকগে রাত্রে ডিনারের জন্য এখনও যথেষ্ট সময় হাতে আছে। সন্ধ্যায় এবং রাত্রে কতকটা বিশ্রাম পাব। কিন্তু খাদ্যের তালিকা পড়ে দেখলাম, বিশ্রাম করা আমার ভাগ্যে নেই, কারণ মধ্যরাত্রের পরই ব্রেকফাষ্ট খাবার জন্য তৈরী হতে হবে। আমি বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কিন্তু যখন জানতে পারলাম সৌদী আরবের সময় বিভাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, আমি যা ভেবেছি তা নয়, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

সৌদী আরবের ২৪ ঘণ্টার দিন সুরু হয় সূর্য্যাস্ত থেকে, কাজেই আরবীয় মধ্যরাতের ১টা মানে আমাদের সকাল ৭টা। তাদের সকাল ৭টা মানে দুপুর ১টা এবং বিকাল ২টা মানে সন্ধ্যা ৮টা। সৌদীতে প্রথম দিনই সে দেশীয় সময় সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় হল, কিন্তু তবু আর একবার সময় নিয়ে বিপদে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। আমি সেখানে পৌঁছার কয়েক সপ্তাহ পরেই এক শুক্রবার রাত্রে এক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বাড়ীতে নৈশভোজে নিমন্ত্রিত হলাম। আমি শুক্রবার রাত্রে নিমন্ত্রণে যোগ দেব স্থির করেছি আমার এক বন্ধুকে তা বললাম। শুনেই তিনি বললেন, মনে হচ্ছে তোমার সৌদী আরবের সময়-জ্ঞান এখনও হয় নি। মনে রেখো শুক্রবার রাত মানে বৃহস্পতিবার

রাত, কারণ বৃহস্পতিবারের সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শুক্রবারের ঈদ আরম্ভ হয়ে যায়। আমি তো হতভম্ব। যাহোক, আমার বন্ধু দয়া করে একথা না জানালে আমি ভোজে অনুপস্থিত থেকে গৃহস্বামীকে শুধু অসন্তুষ্ট করতাম না, নিমন্ত্রণের পরদিন তাঁর গৃহে হাজির হয়ে তাঁকে বিব্রতও করতাম।

সৌদীরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এবং স্নেহপ্রবণ। তারা বিদেশীদের প্রায় সর্ব্বদাই মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করে। এদের ভোজে কয়েকটি রীতিনীতির নূতনত্ব দেখতে পেলাম। খাবার পূর্ব্বে অতি ছোট ছোট হাতলছাড়া পেয়ালাতে কফি নামক একটি তরল পানীয় পরিবেশন করা হয়। যদিও এর নাম কফি কিন্তু আদতে জিনিসটি হল এলাচির সরবত। নিমন্ত্রিত লোকেরা ছোট পেয়ালাতে এলাচির সরবত খুব তৃপ্তির সহিত ধীরে ধীরে পান করে এবং শেষ হলে সেটা ফিরিয়ে দেয়। তক্ষুণি পরিবেশনকারী সরবত দিয়ে সে পেয়ালা আবার পূর্ণ করে হাতে তুলে দেয়। এভাবে যতবার সরবত শেষ করে পেয়ালা ফিরিয়ে দেবে ততবার তা সরবতে পূর্ণ হয়ে আবার হাতে ফিরে আসবে আর এভাবে বহুক্ষণ চলতে থাকবে। যে আরবী ভাষা বা রীতিনীতি না জানে সে কোনো ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলে তার কফি নিয়ে বড় দুর্ভোগ ঘটে।

আমার ভাগ্যেও তাই ঘটল, অবশেষে বাড়ীর কর্ত্তা অনুগ্রহ করে বলে দিলেন যে যখন কফি আর চাই নে, তখন পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে এবং বাঁ থেকে ডানদিকে ঘোরাতে হয়, তা হলেই পরিবেশনকারী আর কফি পরিবেশন করবে না।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাদ্য পরিবেশন করার মধ্যেও নূতনত্ব আছে। প্রকাণ্ড একটা গোল থালাতে বাদাম, পেস্তা এবং নানা প্রকার সব্জীমিশ্রিত পোলাও রান্না করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখে। সেই পোলাওর উপর রোষ্ট-করা একটা আস্ত ভেড়া রাখা হয়, আর পোলাওর চারদিক ঘিরে রোষ্ট-করা মুরগী, পায়রা ও সিদ্ধ ডিম সাজিয়ে দেয়। সুখাদ্য সম্ভারে পূর্ণ বৃহৎ থালাটি দেখে সবারই বিশেষ ক্ষুধার উদ্রেক হয় সন্দেহ নেই। এবার ভগবানের উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎসর্গ করে প্রধান অতিথি প্রথমে থালা থেকে একমুঠো পোলাও তুলে খাবেন। তখন বাকী অতিথিরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থালা থেকে খাদ্য তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করবেন। খাওয়াতে ডান হাতই শুধু ব্যবহৃত হয়। যখন আমি সৌদী আরবের লোহিত সাগরের বন্দর জেড্ডা সহরে ছিলাম তখন সেখানেও ভোজে এই একই ধরণে খাদ্য খেতে দেখেছি।

এই জেড্ডা সহরের অতি কাছেই তাদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কা। যেতে আধঘণ্টা সময় লাগে। সেলাই-করা পরিচ্ছদ পরে যাত্রীরা মক্কায় প্রবেশ করতে পারে না। তীর্থযাত্রীদের জেড্ডা সহরে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করতে হয়। যাত্রীরা একটুকরা কাপড় লুঙ্গির মত কোমরে বাঁধে আর কাঁধে একটা চাদর জড়িয়ে নেয়। এটা দেখে মনে হল দাক্ষিণাত্যের মন্দিরেও পোষাক সম্বন্ধে একই রীতি, কোনো সেলাই-করা জামা পরে পুরুষরা মন্দিরে ঢুকতে পারে না।

সৌদী আরবে বাইরের লোক গেলে সৌদীদের কয়েকটি আচার-ব্যবহারে বৈশিষ্ট্য দেখতে পায়। সৌদীদের জীবনে বেশ কয়েক দিক দিয়ে একটা সাম্য ভাব আছে। গবর্ণমেন্ট অফিসগুলিতেই এর বিশেষ প্রমাণ দেখতে পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। অফিসে যারা কাজকর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে দেখা করতে চায় তাদের জন্য সর্ব্বদা অবারিত দ্বার। অফিসে যে-ই দেখা করতে আসুক, উচ্চপদস্থ অথবা নিম্নপদস্থ, সবাইকে সমানভাবে অভ্যর্থনা করবে অফিসের একজন পিয়ন বা ড্রাইভার। সে সাদরে হাত ধরে বলবে "আলহান ওয়াসলন" মানে আপনি সপরিবারে স্বচ্ছন্দভাবে আছেন? এই ভাবে অভ্যর্থনা করার পর অফিসে তার কি কাজ জিজ্ঞেস করবে।

তাদের সামাজিক আদব-কায়দায়ও বৈচিত্র্য আছে। যখনই একজন সৌদীর অন্য সৌদীর সঙ্গে দেখা হয়, আর সে যদি বিশেষ শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় হয় তখন সে তার একেবারে নিকটে গিয়ে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায় ও সম্ভাষণ করবার সময় তার নাকে নিজের নাক মৃদুভাবে ঘষে। যখন কোন সৌদী কোন কাজে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে চায় তখন সে তার তর্জ্জনী তুলে নিজের নাকে মৃদুভাবে আঘাত করে। তার অর্থ হল, তার কথাই তার দলিল'।

হে কবি জ্যোতির্ময়

॥ শান্তশীল দাশ ॥

তুমি দিলে আলো, তুমি দিলে গান,
তুমি দিলে ভালবাসা;
তুমি দিলে কানে অভয়-মন্ত্র,
নব জীবনের আশা।

যখনি আঁধার নেমে আসে স্মরি
তোমার অভয় বাণী,
দুর্গম পথে সাথে নিয়ে চলি
তোমার মন্ত্রখানি।

সকল আঁধার দূরে সরে যায়,
সকল বেদনা-ক্ষয়;
তোমার মন্ত্র 'অভয় অশোক'
হে কবি জ্যোতির্ময়।

(কিংসলী ফস্টারের "Skip" অবলম্বনে)

॥ গৌরী চৌধুরী ॥

ছুটি···ছুটি

কুপকুপের বেশ খুশী খুশী লাগছিল।

ওকে দেখাচ্ছিলও খুশী। ওর কালো চোখ দুটো পিট্ পিট্ করে হাসছিল, আর খুদে জিভটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে ঠোঁট দুটো চেটে নিচ্ছিল। আর যে ডালটার ওপর ও বসেছিল, তার তলায় ওর বাঁকড়া বাহারে লেজটা ঝুলছিল আর দুলছিল। খুব খুশী হলে লেজটা ওমনি করে দোলায় কুপকুপ।

বনের ভেতর দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দৌড়ে আসতে হয়েছে তো! একটু হাঁপাচ্ছিল কুপকুপ। লোমকোটটাও একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে কী এসে যায় শুনি? পালিয়ে তো আসতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত? আঃ কি আরাম! ছুটি···ছুটি···ছুটি···কোটটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে নিচের দিকে তাকাল কুপকুপ। মগডালে গোটাকতক দাঁড়কাক যে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছিল সে সব কিচ্ছু ওর কানে গেল না, মাটির ওপরে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিচ্ছু চোখে পড়ল না। কেমন সব্বাইকার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল কেবল। 'কেমন মজা, কেমন ঠকিয়েছি'—ভাবতে ভাবতে আপন মনেই হেসে উঠল কুপকুপ। আনন্দের চোটে ডালের ওপর চোঁ করে দৌড় দিল একবার, ধার পর্যন্ত গিয়ে মাটিতে লাফাব-লাফাব ভাব করে আবার কি ভেবে ফিরে এল। বাসায় বসে বসে কুপকুপের কাণ্ড দেখছিল বুলবুলকত্তার ছোট নাতকুড় বুলি। বুলি ভাবছিল—পড়বে নাকি লালটুকটুকে কাঠবিড়ালীটা? নাঃ, ফিরে এসেছে ঠিক। বুলি বললে, 'বাঁচা গেল বাবা!'

সেকথা অবশ্য কুপকুপের কানে গেল না। কুপকুপ তখন আপনমনে বলছে—এখন কী করব? পুরো পাঁচটা ঘণ্টা হাতে রয়েছে। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, কেউ জানে না আমি কোথায়, কেউ না—জোর দিয়ে দুবার করে কথাটা বলল কুপকুপ—মা ভাবছে আমি ইস্কুলে, আর পটকাবুড়ো ভাবছে আমি বাড়িতে।

বেড়ে বানিয়েছি ফন্দিটা—কুপকুপ নিজেকে নিজেই কোলাকুলি করে আর কি!

সারা বৈশাখ-জষ্টি কি কষ্টই না গেছে! অন্যরা যখন বনের মধ্যে ছুটোছুটি ধর-তো-দেখি খেলছে, সে সময়টা ওকে কিনা সারাটা দিন ধরে গরমে সেদ্ধ হতে হতে কাঠবিড়ালী-কত্তার ইস্কুলে বসে থাকতে হয়েছে। লাল কাঠবিড়ালীদের দলের ভেতর উনিই নাকি সবচেয়ে বয়সে বড় আর বুদ্ধিশুদ্ধিতে দড়, তাই সবাই ওঁকে বলে কাঠবিড়ালী-কত্তা। কিন্তু তাঁর ছাত্তরদের ওসব জ্ঞান-গম্যি নেই। সব সবে-উঠতি ছেলে-ছোকরার দল। তারা ওঁকে ডাকে পটকাবুড়ো বলে, আর কত্তা যখন পেছন ফিরে বোর্ডের ওপর আঁক কাটেন কিংবা কষেন তখন মুখ ভেঙায়।

ছটফট করতে করতে আষাঢ় গেল শ্রাবণ গেল, ভাদ্রও যায়-যায়। কুপকুপের প্রাণে আর কত সয়!

অবশ্য রোববার দিনটা পুরো আর শনিবারটা আদ্দেক ছুটি থাকে। কিন্তু তাতে কি! শনিবারের বিকেলগুলো সবই তো ইস্কুলের খেলায় যায়! হয় গাছে চড়, না হয় এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফাও, না হয় তো সেই এক খেলা আছে—শেষে-উঠল-দুয়ো। খেলুড়েরা সব গোল হয়ে দাঁড়াবে, তারপর পটকাবুড়ো বাঁশিতে ফুঁ দেওয়া মাত্তর দৌড়ে গিয়ে গাছের ডালে চড়ে বসতে হবে। যে সবচেয়ে শেষে উঠল, সে হল হেরো, তাকে পুজোর ফণ্ডে দুটো বাদাম চাঁদা দিতে হবে। আবার কেউ যদি কাউকে ধাক্কাধুক্কি দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, তা হলে তার জরিমানা আরো দুটো বাদাম।

রোববার দিনগুলো আরো বিশ্রী। সারাদিন ফিটফাট হয়ে থাকতে হবে, গাছে গাছে দৌড়োদৌড়ি করা চলবে না। আর বিকেল হলেই—সব্বাই জানে ঐ সময়টাই খেলা জমে সবচেয়ে—মা-বাবার পেছন পেছন যেতে হবে হয় বোকা কাকা নয় খুসী পিসী কিংবা কেশো মেসোর বাড়ি। কোথায় সারাদিন রোদে রোদে আপনমনে খেলবে ঘুরবে, নতুন নতুন রাজ্য আবিষ্কার করে বেড়াবে, তা না যত্তো সব—

সাধে কি আর ইস্কুল পালিয়েছে কুপকুপ!

ওর আগেও যে কেউ কেউ এদিকে চেষ্টা করে নি তা নয়, কিন্তু এমন সব বুদ্ধু সেগুলো, একটু যে চোখের আড়ালে থাকবে সেটুকু পর্যন্ত তাদের মাথায় আসে নি। সব কটা ঐ কাঠবিড়ালী-গিজ-গিজে পাড়ার ভেতরেই ঘুরঘুর করেছে, ফলে ধরা পড়েছে আর শাস্তি খেয়েছে।

ওকে আর ধরতে হচ্ছে না—চারিদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিল কুপকুপ। সারা চৌহদ্দির মধ্যে একটি কাঠবিড়ালীর লেজের ডগাটি নেই। কুপকুপ অত বোকা ছেলে নয়!

জায়গাটা কাঠবিড়ালী বন থেকে অনেকটা দূর। কিন্তু ঝোপঝাড় গাছপালা সব সেই একই রকম। তবে এ জায়গাটা একটু যেন বেশি চুপচাপ।

দাঁড়কাকেদের যেমন স্বভাব, সেই গলাবাজি করছে এখানেও। একবার ওপরে তাকিয়ে দেখল কুপকুপ। কতগুলো চক্কর দিচ্ছে আকাশে, কতগুলো মগডালে বসে আছে, কুচকুচে মিশমিশে সব চেহারা। একবার মনে হল, যাবে নাকি তেড়ে? কিন্তু নাঃ, ডালগুলো তত মজবুত নয়, তাছাড়া বড্ডো যেন উঁচু। অত উঁচুতে কখনো চড়ে নি কুপকুপ। ওরা যত খুশি কাকাকাকাকাগ্‌গে, কান বন্ধ করে থাকলেই হল। নিজের সমস্যা ভাবতে বসল কুপকুপ।

কী করা যায়?

পাঁচটা পুরো গোটা আস্ত ঘণ্টা একেবারে হাতের মুঠোয়। যা খুশি করা যায়। কিন্তু করবে-টা কী?

ইস, এতক্ষণে কুপকুপের মনে হল, বাল্টু আর চুলবুলটাকে পটিয়ে পাটিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তিনজনে খুব খেলা জমত। কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ কী! একা একাই মজা করার ফন্দি বার করতে হবে। আবার নিচের দিকে তাকাল কুপকুপ। এতক্ষণ কুপকুপের চোখেই পড়ে নি, যে গাছে ও বসে রয়েছে তার ঠিক তলা দিয়েই একটা রাস্তা চলে গেছে। দেখে তো মনে হয় বেশ রীতিমত যাতায়াতী রাস্তা।

বড়জোর হাতখানেক চওড়া রাস্তাটা। এই রাস্তা দিয়ে যে আনাগোনা করে, সে লম্বায়-চওড়ায় ওর চেয়ে বেশি বড় হবে না। কুপকুপ চন্‌বন্ করে উঠল।

কে থাকে ওখানটায়?

খরগোশ? কিন্তু খরগোশগুলো তো আগোছালো ন্যাতাজোবড়া এলোপাতাড়ির একশেষ, একরাস্তায় দুবার যাবার লোক তো নয়। অথচ এ রাস্তা দিয়ে নিশ্চয় প্রতিদিন কেউ আসা-যাওয়া করে, ঘাসের শীষ একরত্তি ফুল সব দুমড়ে রয়েছে। লোকটা কে? কেমনতরো চেহারা তার?

ডানদিকের ঝোপে একটা খসখস আওয়াজ হল, কান দুটো খাড়া করল কুপকুপ। ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ উঁকিয়ে কুপকুপ দেখল সবজে-হলুদ পাতায় পাতা লালটুকটুক ফলে ফলন্ময় ঝকঝকে ঝোপটার নিচের ডালপালাগুলো জোরে জোরে নড়ছে, মনে হয় যেন কেউ ওধার থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কালো চোখ বড় বড় করে পলক না ফেলে তাকিয়ে রইল কুপকুপ। আরো জোরে নড়তে লাগল সমস্ত ঝোপটা, ঝুপ ঝুপ করে নিচে পড়ে গেল কতকগুলো টুকটুকে ফল। কী রে বাবা! খরগোশ কক্ষণো নয়। খরগোশেরা কক্ষণো ঝোপের ভেতর আটকা পড়ে না। তা হলে কি

তা হলে কি শেয়াল? কানের কাছটা দপদপ করে উঠল কুপকুপের। শেয়াল কখনো চোখে দেখে নি ও, তবে বাবা যা বলেছে, তাতে—

বেশিক্ষণ আর দম বন্ধ করে থাকতে হল না কুপকুপকে। শেষবারের মত নড়ে উঠে ফাঁক হয়ে গেল ঝোপের তলাটা, আর লাফিয়ে পথের ওপর পড়ল—পড়ে গেলই বলা যায়—একটা··· একটা···কী ওটা?

ভুরু কুঁচকে রইল কুপকুপ। জন্তুটার নাম ও জানে না। ছোট্ট একরত্তি জন্তুটা, একেবারে সবে-হওয়া কচি কাঠবিড়ালীর চেয়ে বড় হবে কি হবে না, একটা বড়সড় বাদামের মত। ঐযে যে বাদামগুলোর গায়ে একটা কাঁটা-কাঁটা মতন খোলা থাকে, কিছুতেই ছাড়ানো যায় না, কিন্তু ওটা তো আর কাঁটা-বাদাম নয়, দিব্বি নড়ছে-চড়ছে, একেবারে জ্যান্ত···

কুপকুপ যতক্ষণ বসে বসে ভাবছে-দেখছে ততক্ষণে খুদেটা একটা পাথর টপকে রাস্তা দিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

ডালতলায় আসতেই চোখটা বন্ধ করল কুপকুপ, ইচ্ছে যে চোখ খুলেই দেখবে ওটা আর নেই। ওমা, কোথায় কি! দিব্বি গুটগুট করে চলেছে খুদিরাম! ঝোপটা আর একদম নড়ছে না। মাথার ওপর গোটাকয় পাখি আর মাটির ওপর ঐ ওটা ছাড়া চারপাশে আর জনপ্রাণীটি নেই।

তাড়াতাড়ি মন স্থির করে ফেলল কুপকুপ। এই তো অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ। নিচে নেমে দেখা যাক না ওটা কে কী, কেন কোথায় যাচ্ছে, হাজার হোক এতটুকু বই তো নয়!

চোঁ করে গুঁড়ি বেয়ে নেমে এসে কুপকুপ ডাকলে—এই!

গুড়গুড়ে

অবাক হয়ে কুপকুপ দেখল, কাঁটাদার খুদেটা ওর ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাল না। আরো জোরে যে পা চালাল, তাও না। শুদ্ধু দাঁড়িয়ে পড়ল আর শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা ছোট্ট

বলের মত করে ফেলল। একেবারে হুবহু অবিকল একটি কাঁটা-বাদাম, কিংবা···কিংবা···শুকনো কদমফুল।

কুপকুপও থামল, হাত দুই দূরে। ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

একবার এদিকে একবার ওদিকে মাথা হেলিয়ে ওর মুখটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল কুপকুপ। তাতেও যখন হল না, তখন মাথাটা হেঁট করতে করতে একেবারে মাটিতে নাক-খতই প্রায় দিয়ে ফেলল, কিন্তু কোথায় কী! কিচ্ছুটি দেখা গেল না, কেবল ঐ খাড়া খাড়া কাঁটাগুলো ছাড়া। ঠিক যেন একটা ঘাসের চাবড়া—নরমের বদলে শক্ত আর সবুজের বদলে বাদামী। আর একটু কাছে এগিয়ে গেল কুপকুপ।

'শুনছ?' বেশ চেঁচিয়েই বলল কুপকুপ। জন্তুটার না শুনতে পাবার কথা নয়।

কিন্তু না সাড়া, না শব্দ!

'আরে, শুনছ?' আরো চেঁচাল কুপকুপ।

এবার জন্তুটা একটু কিলবিল করে উঠল। মনে হল আরো যেন গোল হয়ে গুটোতে চাইছে! কিন্তু মুখে কথাটি নেই। আরো কয়েক ইঞ্চি ঘেঁষে এল কুপকুপ, থাবাটা একটু বাড়ালেই কাঁটাগুলো ছোঁয়া যায়, বলল—'এত ভয় পাবার কী আছে শুনি? তোমায় তো আর খেয়ে ফেলছি না?'

আবার কিলবিল। তারপর শরীরের মধ্যিখানটা থেকে একটা কাঁপা গলা—

'আপনি···আপনি কে?'

এতক্ষণে তবু একটা কথা বেরোল যা হোক! বাব্বাঃ! খুশী গলায় বুকটা একটু টান করে কুপকুপ বলল—'আসছি কাঠবিড়ালী বন থেকে।'

আবার কিলবিল। এবার কুপকুপ দেখল, দুটো ওরই মত কালো কুচকুচে চোখ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'অদ্ভুত লোক বাবা তুমি', কুপকুপ বলল, 'পিঠের ওপর ঐ একবোঝা কাঁটার অর্থ? নাম কী তোমার শুনি?'

'আমার নাম? আজ্ঞে, আমাব নাম গুড়গুড়ে। সজারুদের ছেলে আমি।'

'হয়ে গেল হাঁসজারু কেমনে তা জানি না,' আপনমনে বিড়বিড় করে আওড়াল কুপকুপ, 'শুধু সজারু? হাঁসজারু নও তো? থাক কোথায় এড়ায়-বেড়ায়?'

'তা মাঝে মাঝে থাকি। সময়-টময় ভালো থাকলে।'

সময় ভালো থাকা মানে? ও, বোধ হয় গরমের সময় ঝোপে-ঝাড়ে এড়ায়-বেড়ায় বেড়িয়ে বেড়ায়, আর শীতের সময়টা গর্তে-টর্তে সেঁধোয়—ভাবল কুপকুপ।

'কিন্তু তোমার কাঁটাগুলো কিসের জন্যে তা তো বললে না? টানলে খুলে আসে?'

'না, না-না-না বলেন কী?' ব্যস্ত হয়ে বলল গুড়গুড়ে, 'এই গজায় আর কি! মা বলেন ওগুলো আমাদের সহজাত কবচকুণ্ডল।'

'তার মানে?'

'তার মানে···এই ধরুন দেখতেই পাচ্ছেন আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারি না, দাঁত থাবা এগুলোও বড্ড ছোট ছোট। কেউ ধরতে এলে আমরা শুধু গুটিয়ে গোল হয়ে যাই, ব্যস আর ছোঁয় কার সাধ্য।'

এই পর্যন্ত বলে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল গুড়গুড়ে, ভাব দেখে মনে হয় যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু নতুন ভাবের ভাবুড়েটিকে এক কথায় চলে যেতে দেবে, কুপকুপ সে পাত্তরই নয়। জীবনে এই প্রথম একজন ওকে 'আপনি' বলল। নিজেকে বেশ গুরুজন-গুরুজন মনে হচ্ছিল ওর।

'বয়েস কত তোমার খোকা?'—ভারিক্কি চালে জিগ্যেস করল কুপকুপ।

'আজ্ঞে, ছয়'—গুড়গুড়ে বলল।

'ছয়?' কুপকুপ অবাক!

'হ্যাঁ, ছয়ই তো।'

কুপকুপের নিজের বয়স মাত্তর আড়াই। কাজেই এমনিতে অবাক হওয়ারই কথা। কিন্তু সজারুরা তো আর কাঠবিড়ালীদের মতন করে বয়স গোণে না! ওদেরটা অন্য রকম—একথাটা কুপকুপ জানত না। এক পলকে ভেবে নিয়েই কুপকুপ আর একটা প্রশ্ন করল, গুড়গুড়েটা আবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছিল।

'যাচ্ছ কোথায় শুনি? নিশ্চয় খেলতে?'

'মোটেই না, কক্ষণো না',—কথার সুরে বোঝা গেল এ কথায় বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে সজারুটা, 'আমি ইস্কুল যাচ্ছি।'

'ওঃ! ইস্কুল!' ঠোঁটটা উল্টোল কুপকুপ। একবার মনে হল বলবে নাকি সজারুটাকে কেমন করে ইস্কুল পালিয়েছে? নাঃ, এসব বিষয় কাউকে না বলাই ভালো। কা-উ-কে না।

'তাড়াতাড়ি না গেলে আমাদের বড্ড দেরি হয়ে যাবে'—সজারুটা ছটফট করছিল।

'তাই নাকি? আমাদের দেরি হয়ে যাবে? আচ্ছা!'—কুপকুপের ঠোঁটে একটু-একটু হাসি।

'মানে, তাড়াতাড়ি না গেলে'—আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঢাকাল গুড়গুড়ে।

'তোমার ইস্কুলটি এখান থেকে কতদূর হবে শুনি?'

'চারশ' পা।'

'চারশ' পা?' কুপকুপ হতভম্ব।

'হ্যাঁ, আমার পায়ের চারপ' পা। তবে আপনার পা আমার চেয়ে ঢের বড়। আপনার অতক্ষণ লাগবে না।'

এইবার বুঝল কুপকুপ। মাথাটা নাড়ল। চারশ' পা! ভারী মজাদার মাপ তো!

এক লহমা ভেবে নিয়ে কুপকুপ মন স্থির করে ফেলল—

'খানিকটা পথ আমি তোমার সঙ্গে আসতে পারি, অবশ্য যদি তুমি চাও।'

'আসবেন? খুব ভালো হয় তা হলে,—' কৃতার্থ গলায় বলল সজারুটা।

দুজনে একসঙ্গে চলতে আরম্ভ করল।

'দেখো আবার, বেশি তাড়াতাড়ি হেঁটো না যেন, আমি না পিছিয়ে পড়ি'—ঠাট্টা করল কুপকুপ।

সজারু ঠাট্টাটুট্টি বুঝল না, বলল—'না না, তা হাঁটতে যাব কেন?'

বলেই তাড়াতাড়ি পা চালাতে আরম্ভ করল, অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি হাঁটার চোটে কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়তে লাগল, দম প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়, তবু গুড়গুড়ের ভ্রূক্ষেপ নেই, আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে হেঁটেই চলেছে হেঁটেই চলেছে।

কুপকুপের বেশ মজা লাগছিল দেখতে। যতদূর পারা যায় আস্তে আস্তে চলছিল ও।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারল না কুপকুপ, বলল—'এই, ওটা কী করছ?'

গুড়গুড়ে ভুরু কুঁচকে মাথাটা ঝাঁকাল—

'ফুলের তলায় বোঁটা
নয়ের পিঠে ফোঁটা
আটসাঁটি পাট কাট্
দুই চার ছয় আট
শ' নিরেনব্বুই—'

হঠাৎ থেমে গেল গুড়গুড়ে, তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, 'দুশো।'

'ক পা হল গুনছ বুঝি?' কুপকুপ শুধোল।

'হ্যাঁ', হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গুড়গুড়ে, 'অদ্ধেক পথ এসে গিয়েছি আমরা।'

কুপকুপ আর কিছু বলল না। আবার চলতে আরম্ভ করল গুড়গুড়ে। আর কুড়ি-তিরিশ পা

এগোতেই দেখা গেল একটা শ্যাওলা ঢাকা গাছের গুঁড়ি, সেটার পাশ দিয়ে পথ ঘুরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেকটা। চোখটা তুলে ভালো করে দেখল কুপকুপ, এমন চমৎকার জায়গা আজ পর্যন্ত দেখে নি ও—

যতদূর চোখ যায় সবুজে সবুজ—এমন সবুজ ঘাস কুপকুপ এই প্রথম দেখল—গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা বাঁকা লম্বা লম্বা রোদের ফালি তার ওপর এসে পড়ছে। সমস্ত জায়গাটার আকার ডিমের মত, হলুদরঙের তুলতুলে মধুকুপকুপি ফুলে একেবারে ছেয়ে আছে। সব মিলিয়ে এমন চমৎকার আর এমন নরম যে কুপকুপের ইচ্ছে করতে লাগল সমস্তটার ওপর আচ্ছা করে গড়াগড়ি খায়।

ওই ওপাশ দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে একটা রোদ-ঝিকমিক ছোট্ট নদী, বোধহয় ঐ পাহাড়গুলোর ওপর থেকে মাঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চারধারে সব লম্বা লম্বা ছিমছাম গাছ, যেন চড়ার জন্যেই তৈরী। এধারে ওধারে সব পাতা-গিশ্‌গিশে মজবুত ডালপালা, ছুটোছুটি খেলতে হয় তো এখানেই। একটা ছোটখাট স্বর্গ যেন।

'কি অদ্ভুত সুন্দর!' আপন মনেই বলে উঠল কুপকুপ। তারপর সজারু-টজারু সব ভুলে দৌড় দিল, খুব কাছ থেকে সবটা দেখা চাই ওর। ঘাসের ওপর গোটা ছয়েক ডিগবাজি খেয়ে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল কুপকুপ, তারপর পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, পাথরের চারপাশ দিয়ে কিরকম তোড়ে জল ছুটেছে ঝিকমিক করতে করতে। ওখানটা নিশ্চয় খুব ঠাণ্ডা—কুপকুপ ভাবল।

খানিকক্ষণ দেখার পর ঘাড় ফেরাল কুপকুপ—আরে, সজারুটা গেল কোথা? ওমা, ও কি, ও কিরে বাবা—অবাকের চোটে কুপকুপ নদীর জলেই পড়ে আর কি!

সজারুটা একটা জন্তুর সঙ্গে কথা কইছে। জন্তুটা জগতের সবচেয়ে গোদা কাঠবিড়ালীর চেয়েও লম্বায়-সম্বায় অন্তত দ্বিগুণ। ওরা দুজনে আবার এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

পালাব? একমুহূর্ত ভাবল কুপকুপ।

কিন্তু সবচেয়ে কাছের গাছটাও অন্তত হাত চল্লিশ দূরে। আর তাছাড়া চেহারা অত প্রকাণ্ড হলে হবে কি, জন্তুটা তেমন ভয়ানক কিছু নয়। সারা গায়ে কালো বাদামী রঙের ঘন লোম, আর ঝাঁকড়া লেজটা লম্বায় কুপকুপের লেজের দুগুণ, গোছে তিনগুণ। নাকের ওপর সোনার ফ্রেমে বাঁধান একটি চশমা।

সজারুটাও তো ওর সঙ্গে কথা বলছে! আর আমি পারব না? কুপকুপ ভাবল।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই কুপকুপ দেখল, গুড়গুড়ে আর ঐ নতুন জন্তুটা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। বড়টার সঙ্গে পাল্লা রাখতে গিয়ে গুড়গুড়ে পা চালাচ্ছে চরকির মত, অবস্থা কাহিল।

একটু বেগতিক দেখলেই পালাবে ঠিক করে নিয়ে ওদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল কুপকুপ। বুকটা একটু ধুকপুক করছে। [চলবে]

আজব ফলের মেলা

॥ হরিবিষ্ণু সরকার ॥

দিল্লী থেকে অল্প দূরে
ওখলা যাবার পথ ;
সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে
দেখবে মেলাই রথ।

তারই পাশে হল্‌দে মাঠে
আজব ফলের খেলা—
বোশেখ মাসের পয়লা এলে
বসে যখন মেলা।
দেখবে সেথায় ভেল্কী দেখায়
আদমগড়ের ভুলো—
ধূলোয় ফলায় হাজার কলা,
হাওয়ায় নাচায় মূলো।
বস্তা বোঝাই ঝিঙে ওড়ায়,
জলে ভাসায় আম ;
কুলের কাঁটায় গোলাপ ফোটায়,
পলতা গাছে জাম।

কোলাঘাটের পুরুত আসে
দুলিয়ে ইয়া দাড়ি,
ঝুলিয়ে কোঁচা মন্ত্র পড়ে
বেঁধে মাথায় শাড়ী !
নিমের ডাঁটায় আপেল ফলায়,
তেঁতুল গাছে সীম ;
গমের শীষে লংকা ঝোলায়,
বটের ডালে ডিম।
ডালিম গাছে ফলসা নাচায়,
নারিকেলে তাল ;
জবার ডালে চালতা ফলায়,
পাইন গাছে চাল।

তোমরা কি ভাই দেখতে চাও
আজব ফলের মেলা ?
এসো তবে সঙ্গে আমার
জড়িয়ে উটের গলা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

॥ অমরনাথ রায় ॥

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধের নাম কে না জানে। অতি প্রাচীনকালে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নামে একটি নগর ছিল। সেখানে শাক্য বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এই শাক্য রাজবংশেই বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। জন্মকাল ৫৬৬ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ। তখন তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম।

রাজপুত্র গৌতম ছেলেবেলা থেকেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা তাঁর বাড়তে থাকে।

ক্রমে বাল্যকাল পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন সিদ্ধার্থ। বিয়ে করলেন। একটি পুত্র-সন্তানের জনকও হলেন। কিন্তু সংসার তাঁকে মায়ায় বাঁধতে পারলো না। সত্যিই গৃহত্যাগী হলেন সিদ্ধার্থ।

গৃহত্যাগের পর অনেক ঘুরলেন সিদ্ধার্থ। খুঁজে বেড়ালেন মুক্তির পথ। শেষে বুদ্ধগয়ায় বোধি-বৃক্ষের তলায় ধ্যানে বসলেন। ধ্যানে মুক্তিতত্ত্ব তাঁর সুমুখে উদ্‌ঘাটিত হলো। আর তখন থেকেই তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী নামে পরিচিত হলেন।

এরপর বুদ্ধদেব এলেন কাশীর কাছে সারনাথে। সেখানে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হলেন। জনসাধারণকে বোঝালেন যে—কর্মফলের জন্যই মানুষ সুখ বা দুঃখ লাভ করে। এই কর্মফলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই দরকার নির্বাণ বা মুক্তি লাভের। আর আটটি সৎকাজ করলে এই নির্বাণলাভ সম্ভব হয়। সেই আটটি সৎকাজই 'অষ্টমার্গ'। অষ্টমার্গ হচ্ছে :

(১) সম্যগ্‌ দৃষ্টি
(২) সৎবাক্য
(৩) সৎ সংকল্প
(৪) সৎকর্ম
(৫) সৎ জীবন
(৬) সৎ চেষ্টা
(৭) সৎ স্মৃতি
(৮) সম্যক্‌ সমাধি

সারনাথের যে স্থানে বসে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের এই অষ্টমার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই স্থানটিকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ করে রেখে গেছেন সম্রাট অশোক। অশোক ছিলেন মগধের রাজা। কলিঙ্গ রাজ্য জয়ের অল্পকাল পরেই তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধধর্মের আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে সম্রাট অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের অনেক জায়গায় শিলাস্তম্ভ স্থাপন করেন। স্তম্ভগুলির গায়ে ধর্মের বাণী খোদাই করে দেন। এই স্তম্ভগুলি 'অশোক স্তম্ভ' নামে পরিচিত।

সারনাথে এমনি একটি অশোক স্তম্ভ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। যে স্থানে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের অষ্টমার্গের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই স্থানেই অশোক ঐ স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য প্রভু বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের প্রথম দিনের স্থানটিকে স্মরণীয় করে রাখা। কাজেই সারনাথের অশোক স্তম্ভটির যেমন ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, তেমনি আছে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ঐ অশোক স্তম্ভের আর একটি গুরুত্ব আছে। কারণ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক গৃহীত হয়েছে সারনাথের ঐ অশোক স্তম্ভ থেকেই। গ্রহণের তারিখ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী।

স্তম্ভটি বর্তমানে সারনাথ যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এটি একটি গোটা পাথরে তৈরী স্তম্ভ। এই স্তম্ভের শীর্ষে চারটি সিংহমূর্তি পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভশীর্ষে ও কার্নিসের মাঝখানে একটি হাতী, একটি ধাবমান অশ্ব, একটি বৃষ ও একটি সিংহমূর্তি খোদিত আছে। এদের প্রত্যেক দুটির মাঝখানে আছে একটি করে চক্র। এই চক্র ধর্মচক্র নামে অভিহিত হয়। তবে আমরা একে অশোক চক্র বলে থাকি।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক উপরিউক্ত অশোক স্তম্ভের অংশ বিশেষ। এতে চারটি সিংহমূর্তি দেখা যায় না—দেখা যায় মাত্র তিনটি সিংহমূর্তি। আর দেখা যায় তিনটি চক্র, ধাবমান অশ্ব ও বৃষটিকে। রাষ্ট্রীয় প্রতীকের নীচে দেবনাগরি হরফে লেখা আছে "সত্যমেব জয়তে"—অর্থাৎ সত্যই সর্বক্ষেত্রে জয়ী হয়।

'সত্যমেব জয়তে' মুণ্ডকোপনিষদের একটি বাণী। আমাদের দেশ সত্যের আদর্শে বিশ্বাসী। তাই রাষ্ট্রীয় প্রতীকে আমরা উপনিষদের এই বাণীটি রেখেছি। রাষ্ট্রীয় প্রতীক ব্যবহার করতে পারেন শুধু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি। আর পারেন সরকারের অধীনস্থ পদস্থ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান। সরকারী চিঠিপত্রে বা দলিলে এই রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

(একাঙ্ক নাটক)

॥ সুবীর চট্টোপাধ্যায় ॥

কৈফিয়ত ঃ

আজগুবি নয়, সত্যি কথা। এই তো ক'দিন আগে,
ঘটেছিল কি কাণ্ডটা! ভাবতে অবাক লাগে।
দেখিনি ভাই নিজের চোখে আগেই বলে রাখি,
নিজের কানেই শোনা কথা—মিথ্যে হবে তা কি?

পরিচিতি ঃ

হুক্কা-হুঁজুর— বাঁশ বনের শেয়াল রাজা।
কলকে } — ওরা দু ভাই, নেংটি ইঁদুর।
হুঁকো }
ম্যাও-মন্ত্রী— শেয়াল রাজার মন্ত্রী বেড়াল।
চরকি-চাঁদ— ছটফটে এক টাট্টু ঘোড়া।
সড়কি-সিং— ল্যাজপাকানো সেপাই কুকুর।
সাদা-শালুক— সাদা রঙের রাজহাঁস।
গ্যাঙোর-গ্যাঙ— জলার ধারের ওঝা ব্যাঙ।

স্থান—অচিন বনের জলার ধার।
কাল—রাত্রিবেলা। অন্ধকার॥

[প্রথম দৃশ্য]

কলকে ও হুঁকো (গান)—

চকর চকর, চিক চিক চিক
আমরা দুটি ভাই।
খোশমেজাজে মনের সুখে
ঠুংরি খেয়াল গাই॥

নাচছি কেমন বারে বারে
অন্ধকারে, জলার ধারে;
দেখতে হলে দৌড়ে এস
কোন টিকিট নাই।

আমরা দু'জনে বন্ধু বড়ই একই সাথে থাকি।
ইচ্ছে হলেই গলা ছেড়ে, চকর চকর ডাকি॥
ভুলে গিয়ে ঝগড়াঝাঁটি
মারামারি কান্নাকাটি
দু'জনে মিলে দেশ-বিদেশে
ঘুরে যে বেড়াই॥

হুঁকো— চকর, চকর, চোন
শোনরে দাদা শোন—
সেই যে দু'জন রাজার ছেলে
পেরিয়ে সমুদ্দুর,
গিয়েছিল সে কোন দেশে!
অনেক অনেক দূর॥
রাজকন্যে বন্দী আছে দত্যিপুরীর মাঝে,
কোনমতেই পালিয়ে চলে, আসতে পারে না যে।
ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানা
দেয় পাহারা যারা,
সর্বদা যে সজাগ থাকে
সড়কি ক'রে খাড়া॥

ওরা দু'জনে পক্ষিরাজে সেই সেখানে গিয়ে
লড়াই ক'রে পালিয়ে এল রাজকন্যে নিয়ে।
লালকমল আর নীলকমল
সাজবো আজ মোরা,
কোথায় পাবো ঢাল-তরোয়াল
পক্ষিরাজ ঘোড়া?

কলকে— চিক চিক, চিক চাই
রাজপুত্তুর সাজবো মোরা
ঠিক বলেছিস ভাই॥
ঢাল-তরোয়াল করছি যোগাড়
ভাবনা কিছুই নাই,
কিন্তু ভায়া, পক্ষিরাজ
কোনখানেতে পাই?

হুঁকো— চকর, চকর, চে
ঢাল-তরোয়াল সস্তা নাকি!
পয়সা কোথায় হে?

কলকে— চিক চিক, চিক চা
নেহাৎ বোকা হুঁকো রে তুই,
নিরেট মাথাটা॥
চিক চিক চিক, চিককি চাল,
কচুপাতা হবে ঢাল
কঞ্চি কেটে তরোয়াল॥

হুঁকো— চকর, চকর, চ্যাক
দেখরে চেয়ে ত্যাখ।
চারটে ঠ্যাঙ্গে তিড়িং ক'রে
দৌড়ে আসে কে?
আরে আরে চরকি-চাঁদ
টাট্টু ঘোড়া যে॥

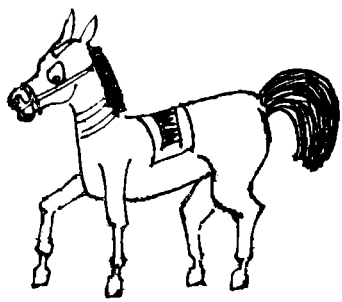

চরকি-চাঁদ— চিঁহিম, চিঁহিম, চুর
ঘুর ঘুর ঘুর ঘুর
নদী সমুদ্দুর ॥
দেশ-বিদেশে ঘুরবো আমি
মেঘ মুলুকে উড়বো আমি
থামবো নাকো ঘামবো নাকো
যাবো অনেক দূর।
চিঁহিম, চিঁহিম, চুর ॥

কলকে— চিক চিক, চিক চি,
এই তো হুঁকো, মনের মতন
বাহন পেয়েছি।
দেশ-বিদেশে ঘুরতে চায়
মেঘমুলুকে উড়তে চায়।
ওকেই চেপে ধরবো আজ,
করবো ঘোড়া পক্ষিরাজ ॥

চরকি-চাঁদ— চিঁহি, চিঁহি, চা
শোন কথাটা ॥
লাট্টুর মতো ঘুরি টাট্টু ঘোড়া
চটপটে ঠ্যাং আছে, ঠিক দু'জোড়া ॥
চিঁহি, চিঁহি ডাকি
পা বাড়িয়ে থাকি,
সাথে যাবে নাকি ?

কানা নই, বেতো নই, নই গো খোঁড়া।
লাট্টুর মতো ঘুরি টাট্টু ঘোড়া ॥

কলকে— চিক চিক, চিক চাই
টাট্টু ঘোড়া ভাই,
তোকেই মোরা চাই।
কাঁধে নিবি ঝক্কি আজ,
তুই আমাদের পক্ষিরাজ ॥

চরকি-চাঁদ— চিঁহি, চিঁহি, চি
আরে আরে কি জ্বালাতন
বলছো তুমি কি ?
আমি যদি পক্ষিরাজ, কোথায় আমার ডানা ?
দুটো চোখে দেখতে না পাও, তুমি কি রাতকানা ?
চিঁহি, চিঁহি, চাই
পথ ছেড়ে দাও, ছুটবো এবার
পাঁই পাঁই, পাঁই পাঁই ॥

হুঁকো— চকর, চকর, চে
রাজহংসের ডানা দুটো
কাঁধে জুড়ে নে।
ঐ যে আসে সাদা-শালুক
ডানা দুটো তার
একটা রাতের জন্যে তোকে
দেবে না কি ধার ?

সাদা-শালুক—প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক পা
নাহে বাপু, এই বাজারে
ধার চলবে না ॥

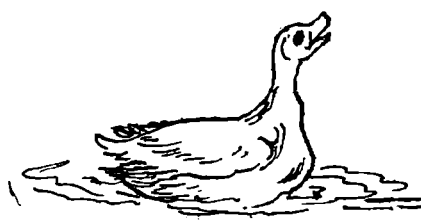

গুগলি গেঁড়ি শামুক চাও ?
নগদা দামে কিনেই নাও।
ফেলো কড়ি মাখো তেল,
কি চাই তোমার বাৎলে দাও ॥

কলকে— চিক চিক, চিক চা
ওসব কিছুই না।
আমরা যাবো দেশ-বিদেশে
নদী-নালা সাগর-শেষে,
চরকি-চাঁদ সাজবে মোদের
পক্ষিরাজ ঘোড়া।
এক রাত্তির ধার দাও ভাই
তোমার ডানা জোড়া ॥

সাদা-শালুক—প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক পায়
কি বললে, ডানা দেবো !
ইস্ কি আব্দার !!
কত সাধের ডানা আমার
শাঁখ-মাজা রঙ তার।
দুধসাগরে ভিজিয়ে রাখা
পালক চমৎকার ॥
পয়সাকড়ি নেবো না।
সাধের ডানা দেবো না ॥

হুঁকো— চকর, চকর, চুক
বটে বটে এমন কথা
বিদ্‌ঘুটে উল্লুক।
আঁচড়ে দেবো, কামড়ে দেবো, বামড়ে দেবো চড়।
কলকে দাদা, দুষ্টুটাকে খপাং ক'রে ধর ॥

কলকে— চিক চিক, চিক চাস
ঠিক বলেছিস হুঁকো ভায়া
হাঁস বড় বদমাশ ॥
' কু ক'রে ধর দেখি রে
পাখাদুটো নেবোই ছিঁড়ে ॥
রেডি, রেডি, এক দুই তিন
শাবাশ, শাবাশ।
রাগিয়ে দিলি যখন মোদের
তবেই সর্বনাশ ॥
চিক চিক, চিক চাস।

চরকি-চাঁদ—
চিঁহিম চিঁহিম চিঁহিম চাগ,
নারদ, নারদ লাগরে লাগ ॥
আমার বাপু সময় নাই,
দেশ-বিদেশে ঘুরতে যাই ॥
[টাট্টু ঘোড়া পালিয়ে গেল
লাগলো লড়াই জোর।
দুই ইঁদুরে হাঁসখানাকে
ঠেঙাচ্ছে জব্বর ॥]

সাদা-শালুক—
প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক পে
গুণ্ডাদুটো ফেলছে মেরে
গেছি, গেছি রে।
কে আছো গো বাঁচাও আমায়,
দারুণ আঘাত লাগলো মাথায় ;
ঠোঁট কেটেছে, ঠ্যাং ভেঙেছে
চলতে পারিনে।
ওরে বাবা মরে গেলাম,
প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক পে ॥
[হাতে লাঠি, লাল পাগড়ি, খাকি পোশাক গায়
পুলিশ সেপাই সড়কি-সিং চলছিল রাস্তায় ;
লড়াই দেখে আসলো ছুটে খাড়া ক'রে লাঠি।
ইঁদুর দু'জন ঘাবড়ে গিয়ে, থামায় ঝগড়াঝাঁটি ॥]

সড়কি-সিং—ভৌ ভৌ ভৌ ভিট
একটা লাঠির ঘায়ে তোদের
করবো আমি ঢিট।

পাজি, ছুঁচো, দাঙ্গাবাজ
খুব হয়েছিস চাঙ্গা আজ?
ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হবি
রাজার কাছে চল।
পালিয়ে গেলে দেখবি মজা
ভৌ ভৌ, ভৌ ভল॥

[দ্বিতীয় দৃশ্য]

[ইঁটের পাঁজায় শেয়াল রাজা
গাইছে খেয়াল গান।
মন্ত্রী বাজায় ভাঙ্গা হাঁড়ি
বড়ই মিঠে তান॥

পুলিশ কুকুর ঢুকলো, সাথে
তিন দাঙ্গাবাজ।
ব্যাজার হয়ে গান থামালেন
শেয়াল মহারাজ॥]

হুক্কা-হুঁজুর—হুক্কা-হুয়া হাই
শান্তিতে যে সাধবো গলা
তারও উপায় নাই।

এসে হাজির তিনটে আপদ
ব্যাপার কি, সেপাই?

সড়কি-সিং—ভৌ ভৌ, ভৌ ভে
চৌকি দিয়ে ঘুরতেছিলেম
গাঁয়ের পথেতে।
এমন সময় দেখতে পেলেম
অচিন জলার ধারে,
তিন বদমাশ করছে লড়াই
রাতের অন্ধকারে॥

হুক্কা-হুঁজুর—হুক্কা-হুয়া হি—
হারে হারে ঝগড়াটে দল,
ব্যাপারখানা কি?

হুঁকো— চকর, চকর, চাম
হুঁজুর গো পেন্নাম,
হুঁকো আমার নাম।
আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে কলকে, মহারাজ!
আমরা হবো রাজপুত্তুর, কোথায় পক্ষিরাজ?

কলকে— চিক চিক, চিক চার
কষ্ট ক'রে টাট্টু ঘোড়া
করেছি যোগাড়॥
কিন্তু হুঁজুর বিপদ বড়ই
ডানা কোথায় তার?

সাদা-শালুক—প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক পাজ
আমার দুটো সাধের ডানা
দেখুন মহারাজ,
ছিঁড়েই নিতো গুণ্ডাগুলো
মেরেই দিতো জানে।
ভাগ্যে হুঁজুর সেপাই সাহেব
গেছিলো সেইখানে!

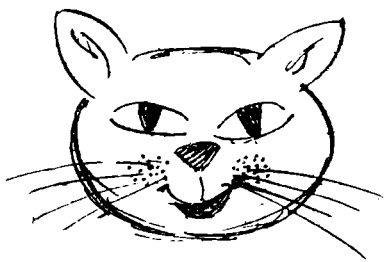

ম্যাও-মন্ত্রী—মেয়াও, মেয়াও, ময়
হুঁজুর শুনুন, ব্যাপারটা তো
খুব সুবিধের নয়॥
হাঁসের ডানা ছিঁড়ে নিয়ে
ঘোড়ার পিঠে লাগিয়ে দিয়ে,
টাট্টু ঘোড়া পক্ষিরাজ!
এও কি কভু হয়?
ভূত-পেত্নী ভর করেছে।
তাই তো আমার ভয়,
মেঁয়াও, মেঁয়াও, ময়॥

হুক্কা-হুঁজুর—
হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুক্কা, হুক্কা-হুয়া হা।
মন্ত্রী তুমি বলছো একি! কাঁপছে আমার গা।
ঐ যে দূরে যাচ্ছে ওঝা, ওকেই ডাকো না।

ম্যাও-মন্ত্রী—মেঁয়াও, মেঁয়াও, ম্যাঙ
এইদিকেতে এসো দেখি
ওহে ওঝা ব্যাঙ॥
[ডান হাতেতে মুড়ো ঝাঁটা।
তাতে কিছু বাবলা কাঁটা॥
বাঁ হাতেতে মড়ার খুলি।
গলায় মালা, কাঁধে ঝুলি॥
আসলো ওঝা, 'গ্যাঙোর-গ্যাঙ'।
খ্যাবড়ামুখো, লম্বা ঠ্যাং॥]

গ্যাঙোর-গ্যাঙ—গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গাই
বলো দেখি, কি হয়েছে?
ঝেড়ে-ফুঁকে যাই॥

ম্যাও-মন্ত্রী—মেঁয়াও, মেঁয়াও, মে
শোন ওঝা হে,
নেংটি ইঁদুর দুটোর ভায়া
ভূতেই পেয়েছে॥
টাট্টু ঘোড়ার পিঠে জুড়ে
হংসরাজের ডানা,
এরা দু'জন বানাতে চায়
পক্ষিরাজ একখানা॥

হুক্কা-হুঁজুর— হুক্কা-হুয়া হিক
তুক-তাক আর মন্ত্র পড়ে
দাওগো ক'রে ঠিক ॥
গ্যাঙোর-গ্যাঙ—
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গাপ
'ঔড়ন' ভূতে পেয়েছে ওদের
বাপরে বাপরে বাপ ॥
ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়তে হবে,
বাবলা কাঁটা মারতে হবে,
চোখ দুখানা গালতে হবে,
মাথায় গোবর ঢালতে হবে।

আগুনেতে ঝলসে নিয়ে
লঙ্কাপোড়া নাকে দিয়ে
মারতে হবে সাত আছাড়।
দেখবে চোখে অন্ধকার ॥
তারপরেতে ঠ্যাং দুখানা
ওপর দিকে তুলে,
শিরিষ গাছে ঘণ্টা তিনেক
থাকবে ওরা ঝুলে ॥
'ঔড়ন-ভূত' ছাড়বে তবেই, নইলে পরে নয়।
"ঔড়ন ছুঁলেই কেলেঙ্কারি," শাস্ত্রে এমন কয় ॥
হুক্কা-হুঁজুর—হুক্কা-হুয়া হাও
ওগো ওঝা, ঝাড়ফুঁক সব,
শুরু করেই দাও।
কথা ব'লে মিথ্যে সময়, নষ্ট কোরো না।
আমার দারুণ ভয় করছে, হুক্কা-হুয়া হা ॥
গ্যাঙোর-গ্যাঙ—
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গা
(ভূত তাড়ানো মন্ত্র) ফুড়ুক, ফুড়ুক ফা ॥
যা যা ঔড়ন-ভূত
ঝটৎ পটৎ ফুঃ।
পক্কবিম্ব, নিম্বডাল
খা বার্তাকু ॥
শিবের জটা—মারবো চাবুক,
লঙ্কাপোড়া—জ্বালাবো বুক ॥
মাথা থেকে ঔড়ন নাবুক,
হড়াম, দড়াম, ভূ—!
ত্রিবিক্রম, শিব-ইন্দ্রম
পা পিছলে আলুর দম
ব্যোম-ভোলানাথ বম্ভম-বম
ছলাৎ ছলাৎ ছুঃ।
ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়বো বিষ
বুঝবি ঠ্যালা, হুঁঃ ॥
যা, যা, ঔড়ন-ভূত
ঝটৎ পটৎ ফুঃ।
হুক্কা-হুঁজুর—হুক্কা-হুয়া, হুক্কাহুক
ঘুরছে মাথা, কাঁপছে বুক।
কানে কেমন লাগলো তালা,
ঝাপসা দেখি, এ কি জ্বালা!
পড়ে গেলাম ওরে বাবা, ধররে তুলে ধর,
অলক্ষুণে খুনে ওঝা, ওকেই জবাই কর।
ম্যাও-মন্ত্রী—ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও, মান
ওরে সেপাই দৌড়ে গিয়ে
বস্তি ডেকে আন।

চোখ কপালে তুলে রাজা
হলো যে অজ্ঞান ॥
গ্যাঙোর-গ্যাঙ—
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গান—
কি সব্বোনাশ পালাই এবার
বাঁচবে না আর প্রাণ।
জ্ঞান ফিরলেই শেয়াল রাজা
নেবে যে গর্দান।
এক লাফেতে শ্মশানে যাই
গ্যাঙোর, গ্যাঙোর, গান ॥
[গ্যাঙোর-গ্যাঙ লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল দূর।
সেপাই ছোটে বদ্যি খোঁজে, হাওড়া কি শিবপুর !]
হুঁকো—চকর, চকর, চাই
আজ আমাদের জানটা যেতো
খুব বেঁচেছি ভাই।
নাক খৎ দে' মলছি কান,
চলরে দাদা বর্ধমান ॥
কলকে—চিক চিক, চিক চায়
আয়রে রাজহাঁস মোদের সাথে
তুইও চলে আয় ॥
চালতা-আদা-কাঠাল-ডাব,
হাত মিলিয়ে করছি ভাব।
পক্ষিরাজে চড়বো না
ঝগড়াঝাঁটি করবো না
তোর সঙ্গে লড়বো না ॥
কি যে হতো ভাবতে গেলে
মুণ্ডু ঘুরে যায়।
আয়রে হুঁকো, আয়রে হাঁস,
চিক চিক, চিক চায় ॥
হুঁকো, কলকে ও সাদা-শালুক (সমস্বরে)—
চিক চিক চিক, চকর চকর
প্যাঁক প্যাঁক, প্যাঁক পাই।
হাত মিলিয়ে ভাব করেছি
করবো না লড়াই ॥
আমরা হলাম লক্ষী আজ,
যারে দূরে পক্ষিরাজ !
পা থাকতে ভাবনা কি রে
হেঁটে হেঁটেই যাবো।
বর্ধমানের সীতাভোগ
মিহিদানা খাবো ॥
হাত মিলিয়ে ভাব করেছি ভাবনা যে আর নাই,
মনের সুখে গলা ছেড়ে গিটকিরি গান গাই।
চকর, চকর, চিক, চিক, চিক
প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক, পাই ॥

[বিঃ দ্রঃ—নাটকটি অভিনয় করতে হলে, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, ১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৪ (ফোন ৫৫-৭৮৮৩) এই ঠিকানায়, লেখকের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।]

ধীরে ধীরে উড়ো জাহাজখানা নীচে নেমে আসছে। জানলার ধারের আসনখানায় বসেছে অরুণাংশু। এখন নীচের সব কিছু ওর চোখের সামনে স্পষ্ট—উজ্জ্বল। পর্দা সরিয়ে ও নীচের দিকে তাকাল।

দুধ সাদা প্রান্তরের বিস্তৃতি নীচে—উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো। মনে হচ্ছে কে যেন স্ফটিক-শুভ্র সমুদ্র-তরঙ্গগুলোকে থামিয়ে দিয়েছে। একটার পর একটা তরঙ্গ তাই স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কোথাও কোন সবুজের চিহ্ন নেই। একটা সরল রেখা ধরে সোজা উড়ে চলেছে ওদের উড়ো জাহাজ।

ঘড়ি দেখল অরুণাংশু। পাঁচটা। সূর্য এখনও পুব-আকাশে উঁকি দেয় নি। তবু আলো ছড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। একটানা ছ'মাস দিনের দেশে চলেছে ওরা। এখনো গন্তব্যস্থলের অনেকটা বাকি। তবু প্রকৃতির বুকে পরিবর্তিত অবস্থা ওদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, ওরা কাছে পৌঁছেছে। আকাশের এই উজ্জ্বলতা তাই অস্বাভাবিক নয়।

কলকাতার কথা ভাবে অরুণাংশু। এখন কলকাতায় বৈকাল। এসময় কি আর অরুণাংশুরা ঘরে থাকত? থাকত না। মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গল মাঠে হাজির হত। খুব ভালো না খেললেও সে একজন উৎসাহী ফুটবল খেলা দর্শক। তাই ত কোন খেলাই দেখা বাদ যেত না অরুণাংশুর।

—কি ভাবছ মিত্র? বরফ দেখে মোহিত হয়ে গেলে যে!—বৃদ্ধ অধ্যাপক গ্রীণ তাঁর প্রিয় ছাত্রকে উদ্দেশ করে বললেন। অরুণাংশুর ঠিক পাশের সিটখানায় বসেছেন গ্রীণ সাহেব।

—একেবারে মোহিত না হলেও, উড়ো জাহাজ থেকে নীচে বরফের প্রান্তরটাকে খুব ভালো লাগছে স্যার! তা'ছাড়া জানেন ত আমরা গরমের দেশের মানুষ, তাই জল দেখলে, বরফ চোখে পড়লে কিংবা বর্ষার জল-ভেজা মৃদু হাওয়ার স্পর্শ পেলে আমাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে। জানেন আমাদের কবি কি বলেছেন বর্ষা বন্দনা করতে গিয়ে?

জানলা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সৌম্য-মূর্তি অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকাল অরুণাংশু।

—কি বলেছেন তোমাদের কবি? আই মীন তোমাদের কবি মানে টেগোর। আমি ওঁর অনেক বই পড়েছি মিত্র। খুব বড় কবি। বল শুনি তাঁর কবিতা।

অধ্যাপক গ্রীণ কবিতা শোনবার আগ্রহে বুঝি খানিকটা খুশী হয়ে উঠলেন।

অরুণাংশু মৃদু অথচ উদ্দীপনার সঙ্গে বলল—বর্ষার মেঘ আকাশ ছেয়ে এগিয়ে আসছে। আর দেরী নেই বর্ষণের। তাই কবির মন খুশীতে টই-টম্বুর। 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচেরে, হৃদয় নাচে রে!' বুঝলেন স্যার, বর্ষার মেঘ দেখলে ময়ূরেরা পেখম ধরে নাচতে থাকে—তাই কবি ও-কথা বলেছেন।

—সুন্দর বলেছেন টেগোর! জান মিত্র, যখন আমি তোমাদের কথা ভাবি, আই মীন তোমাদের মতন ভাব-প্রবণ বাঙালীদের কথা চিন্তা করি, তখন আমার মনে হয় টেগোর কবি উপযুক্ত দেশেই জন্মেছিলেন। আর কোন দেশে, আর কোন জাতির মধ্যে জন্মালে হয়ত পৃথিবী একজন কবিকে লাভ করত সত্যি কথা—কিন্তু টেগোর কবি জন্মাতেন না।

বলতে বলতে বৃদ্ধ অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে ওঁর পাণ্ডিত্য সর্বজন-স্বীকৃত। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ ইতিহাস উনি লিখেছেন। সরেজমিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানব-সমাজের আচার-আচরণ জানবার জন্য তিনি বহু দেশে গিয়েছেন। আদিম জাতি সমূহের বংশধর বলে পরিচিত অনেক অসভ্য ও অর্ধ-সভ্য মানব-জাতির সঙ্গে তিনি বাস করেছেন। তাদের সঙ্গে মিশেছেন। কি ভাবে আদিমতার স্তর থেকে তারা ক্রমোন্নত পর্যায়ে উঠে এসেছে তা তাদের আচার-আচরণ, ভাষা, দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জানতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই তাঁর রচনা কেবল নীরস তত্ত্ব কথা নয়—বরং অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এক অপূর্ব কথন। অনেকটা রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতন! বিশ্বের পণ্ডিত-সমাজে অধ্যাপক গ্রীণের পুস্তক সেইজন্য এত বেশী সমাদৃত।

নর-তত্ত্বের ছাত্র হলেও গ্রীণ সাহেবের মন সাহিত্যধর্মী। আজকের এই আলোচনার জন্য নয়, অধ্যাপক গ্রীণ যে মনে মনে সাহিত্যকে ভালোবাসেন তার পরিচয় অরুণাংশু আরও অনেক পেয়েছে। ওঁর স্টাডিতে নৃ-তত্ত্বের পুস্তকের পাশে শেক্সপীয়রের নাটকও স্থান পেয়েছে। টেগোরের

সমস্ত ইংরেজী অনুবাদ উনি পড়েছেন। শুধু পড়া নয়, তার সাহিত্যিক মূল্যায়ন পর্যন্ত করেছেন। সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ প্রখ্যাত সাহিত্যিকের রচনা তিনি বিচার করেছেন, কতদিন এসব নিয়ে অরুণাংশুর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে।

—তা এখন কি ভাবছিলে মিত্র? টেগোর কবির কবিতা না-কি?

—না স্যার। ভাবছিলাম, কলকাতার কথা। ওখানে এখন অপরাহ্ণ। সারা কলকাতা আসন্ন রাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে—বলতে বলতে অরুণাংশুর কণ্ঠে এক বিষণ্ণ বেদনার সুর ফুটে উঠল।

হয়ত ওর বিষণ্ণতা বৃদ্ধ অধ্যাপকের হৃদয়ে আঘাত হানল। উনি বলে উঠলেন—বাড়ীর কথা মনে পড়ছে না মিত্র? হোম সিক্‌নেস। রিয়্যালি, আই ফিল ফর ইউ।

অরুণাংশু কিছু বলতে পারল না। জানলা দিয়ে নীচে বরফ-প্রান্তরের দিকে তাকাল।

অরুণাংশু নিজে নর-তত্ত্বের ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো ভাবে পাস করে বৃত্তি পেয়েছিল। ফোর্ড-ফাউণ্ডেশনের মোটা টাকার বৃত্তি নিয়ে বছর দুয়েক আগে এসেছিল আমেরিকায় পড়তে। এখানে ছিল অধ্যাপক ডক্টর গ্রীণের ছাত্র। নিরহঙ্কার জ্ঞান-বৃদ্ধ অধ্যাপক নিজের ছেলের মতন অরুণাংশুকে ভালোবাসেন। নিজের জ্ঞানের সমস্ত সঞ্চয় উনি সব অরুণাংশুকে দিয়ে যেতে চান। তাই এই বিদেশী তরুণ সব সময় ওঁর সঙ্গী।

মাঝে মাঝে উনি দুঃখ করে বলেন—জীবনে অনেক আশা ছিল মিত্র, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না।

—কেন স্যার, নৃতত্ত্ব বিষয়ে আপনার নাম বিশ্ব-পরিচিত। তা'ছাড়া আপনার তত্ত্ব মৌলিক।—অরুণাংশু গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিল।

—না না, মিত্র। আমি নিজে জানি আমি কিছুই করতে পারি নি। আর করব কখন? বাবা ছিলেন কারখানার শ্রমিক। আমার পড়াশুনার জন্য অনেক খরচ যোগানো তাই তাঁর পক্ষে ছিল একরকম অসম্ভব। ছাত্র-জীবনে তাই নিজের পড়াশুনার খরচ নিজে রোজগার করেছি। খবরের কাগজ বিক্রী করেছি। জান মিত্র, প্রত্যেক দিন সকালে স্টেশনে খবরের কাগজ ফিরি করতাম।

বলতে বলতে বৃদ্ধ অধ্যাপক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

অরুণাংশু সেদিন এই বিশ্ব-বন্দিত মানুষটির সংগ্রামী জীবনের কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আজ অধ্যাপক গ্রীণের কোন অভাব নেই। নাম-অর্থ-প্রতিপত্তি সব তাঁর হাতের মুঠোয়। জাতীর অধ্যাপক উনি। মোটা টাকা সম্মান-মূল্য হিসাবে সরকার তাঁকে দেয়। যে বাড়ীতে তিনি থাকেন সেখানা সরকারের। তাঁর জন্য সরকার গাড়ী দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত

প্রয়োজনীয় বস্তু সব সময় তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে। তঁ: কাজ শুধু মানুষের জ্ঞানাতীত বিদ্যাকে আহরণ করা এবং সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার মানব-কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া। বৃদ্ধ অধ্যাপক সেই মহান কাজে রত।

আশ্চর্য, আজকের ডক্টর গ্রীণকে দেখে, অরুণাংশু কল্পনা করতেও পারে না যে, এই মানুষ একদিন সংবাদপত্র ফিরি করতেন; অর্থ অর্জন না করলে তিনি পড়ার খরচ দিতে পারতেন না। ছাত্র-জীবনে বিলাস-ব্যসন কিংবা আর্থিক-স্বচ্ছলতা তাঁর কাছে ছিল স্বপ্নের বস্তু।

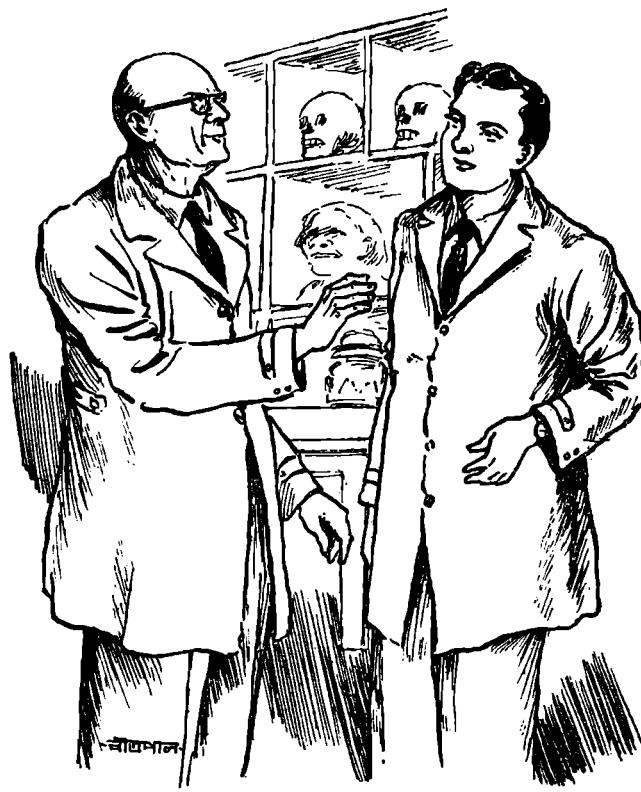

—অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে পড়তে হত। দিনের বেলা সময় নষ্ট করতাম অর্থ রোজগারের চাহিদায়। রাতে অপচয় পুষিয়ে দিতাম। গভীর রাত পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে সময় কাটাতাম। কিন্তু তাতেও কি সব শিখতে পারলাম মিত্র? পারলাম না। জ্ঞানের সীমা-রেখা যে অনন্ত বিস্তৃত—তাকে পরিভ্রমণ করবার শক্তি কোথায় আমার? নিউটন বলেছিলেন যে, তিনি জ্ঞান-সমুদ্রেদ তীরে নুড়িপাথর কুড়োচ্ছেন। আমার কি মনে হয় জান মিত্র, আমি আজও সামান্য একটা বালির কণাও কুড়োতে পারি নি!···আক্ষেপের সুর ফুটে ওঠে ওঁর কণ্ঠে।

জ্ঞান আহরণের অতৃপ্ত বাসনা তাঁর মনে। অরুণাংশু জানে যে. মহাপণ্ডিতদের মনের এই এক প্রবণতা। জ্ঞান-রাজ্যের সিংহদ্বারের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা জানেন তুলনায় তাঁরা কত ক্ষুদ্র। তাই অহঙ্কার নয়, বরং অক্ষমতার আক্ষেপে তাঁদের মন ভরে যায়। এক জীবনে যতদূর সম্ভব তাঁরা অর্জন করতে প্রয়াসী হন।

—ভেবেছিলাম আমার প। যা সম্ভব হয় নি, আমার ছেলের জীবনে তা' সম্ভব হবে। আমার অসম্পূর্ণ সাধনা আমার ছেলে পূর্ণ করবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক।

—স্যার, রবার্ট গ্রীণকে আপনি বিজনেস্ লাইনে যেতে দিলেন কেন? নৃতত্ত্ব বিষয়ে ওঁর কি আগ্রহ ছিল না?···অরুণাংশু যেন বিষণ্ণ অধ্যাপককে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলেছিল।

—রবার্ট আমার ছেলে হলেও আমার পথে চলতে চায় নি। ওর মামারা সব বিখ্যাত বিজনেসের ক্ষেত্রে। মায়ের ইচ্ছায় রবার্ট বিজনেস লাইনে ঢুকে পড়ল। ও ত এখন নিউইয়র্কেও থাকে না; দক্ষিণে বার্মিংহামে থাকে।

আজ দু'বছরের ওপর হল অরুণাংশু এই জ্ঞান-বৃদ্ধের সংস্পর্শে এসেছে। নিজের ইচ্ছায় কিংবা অধ্যাপকের অনুরোধে বহুবার সে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছে। নূতন নূতন মতবাদের আলোচনায় বিশ্লেষণে সে ডক্টর গ্রীণের সঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু একদিনের জন্যও রবার্ট গ্রীণকে এ-বাড়ীতে দেখে নি। শুনেছে বিগত দশ বছরের মধ্যে মাত্র দু'বার বাবা-মাকে দেখতে এসেছিল রবার্ট। আশ্চর্য, এদেশের বাপ-মার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক কি রকম ছাড়াছাড়ি। সন্তান বড় হলে মাপ-মার সঙ্গে তার হৃদ্যতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।

—মেয়ে ও-হারার উপর আশা ছিল। পড়াশুনার দিকে ওর নজর ছিল খুব তীক্ষ্ণ। কিন্তু হল না। বছরের সেরা-সুন্দরী নির্বাচিত হল আমার মেয়ে। তখন ও কলেজের ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছে হলিউডে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান এল। আজকের দিনে এমন আহ্বান, আমেরিকার ক'টা মেয়ের ভাগ্যে জোটে বল, মিত্র? ও-হারা কলেজ ছেড়ে হলিউডে যোগ দিল। এখন ত ও বিখ্যাত স্টার। কাগজে কাগজে ওর ছবি ছাপে। পয়সার অভাব নেই ও-হারার! কিন্তু আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল মিত্র। নৃতত্ত্বের গবেষণা আমার বংশের কেউ কি আর কোনদিন করবে?

অরুণাংশুও গভীর বেদনা অনুভব করল। এই হচ্ছে জীবনের সত্যিকারের ট্র্যাজেডি! সব থেকেও সব শূন্য! শুধু আশাভঙ্গের বেদনায় ক্লিষ্ট অন্তর। যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েও কি মানুষ তার জীবনের আশা-স্বপ্ন সফল করতে পারে না?

জ্ঞান-বৃদ্ধের ভালোবাসা তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই বিদেশী তরুণের উপর ঝরে পড়ছে। মাঝে মাঝে উনি এমন সব কথা বলেন যা একান্তই অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু ওঁর বিশ্বাসের মধ্যে কোন খাদ নেই, তাই ওঁর কথাগুলো আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও একটা সত্য যে ফল্গুর ধারার মতন গভীর অতলে নিহিত তা বুঝতে পারা যায়। আমেরিকা আর শুধু আমেরিকা কেন সারা ইউরোপ অর্থ অর্জনের জন্য কৃষ্ণীপাকে অবিরাম ঘুরছে। তাদের জ্ঞানার্জনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে তা হচ্ছে কি করে আরও আরও অর্থ অর্জন করা যায়। জ্ঞানের যা একমাত্র আদর্শ মানব-কল্যাণ—তার কথা তারা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত। তাই বিদ্যা তাদের শক্তিশালী করে তুলেছে সত্য, কিন্তু বিনয়ী করে নি। মানব-কল্যাণে জ্ঞানকে তারা সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ করতে পারছে না। এর জন্য চাই উদ্দীপ্ত

প্রাণ, নিরহঙ্কার মনোবৃত্তি আর বিনয়-নম্র আচরণ। বাণিজ্য-প্রেমিক অর্থলোভী মানুষরা এ চরিত্র কোথা থেকে পাবে? নগণ্য হলেও, দরিদ্র হলেও এই আদর্শের মানুষ আজ জন্মগ্রহণ করেন একমাত্র ভারতবর্ষের বুকে। বহু বছরের সাধনায় ভারতের মানুষ জেনেছে, মানব-কল্যাণ জীবনে একমাত্র আদর্শ; বিনয়, ধর্ম এবং জীব-সেবা ঈশ্বর আরাধনার প্রকৃষ্ট উপায়। তাই আজকের জ্ঞান-রাজ্যের প্রকৃত ধারক হবে ভারতের মানুষ।

এমন মানুষের সংস্পর্শে এসে অরুণাংশু তাই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছে। তাঁর সাহচর্যে থেকে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে যা কিছু জানার তা সে জেনে নিচ্ছে। এর জন্য সে নিজে গভীর সাধনায় রত।

বিশ্ব-প্রকৃতি একখানা অলিখিত বিশাল গ্রন্থ। সমুদ্র-পর্বত-নদী-হ্রদ-মরুভূমি-বনাঞ্চল এক একখানা পৃষ্ঠা—কত জানবার কথা এইসব প্রকৃতি পুস্তকের পৃষ্ঠায় সন্নিবদ্ধ রয়েছে। তাকে পড়তে জানলে সৃষ্টি-রহস্যের অনেক কিছু জানা যায়। অচল-অনড় এইসব বস্তুপিণ্ড যে-কথা বলে সে-কথা শোনবার উপযুক্ত কান এই পৃথিবীতে যে ক'জনের আছে ডক্টর গ্রীণ তাদের অন্যতম। তার পরিচয় অনেকবার পেয়েছে অরুণাংশু।

সরকারী কাজে ডক্টর গ্রীণকে মাঝে মাঝে এখানে ওখানে যেতে হয়। কখনও কখনও বক্তৃতা দিতে হয়। অরুণাংশুর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে ডক্টর গ্রীণ যেখানেই যান ওকে সঙ্গে নিয়ে যান। বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণের ঘনিষ্ঠ ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও বাস্তবে এই ঘনিষ্ঠতা দিন দিন মধুর হয়ে উঠছিল। ইদানীং কলেজ-মহলে এটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই জন্যই গ্রীণল্যাণ্ডের উত্তরাংশে একদল বৈজ্ঞানিককে পাঠান হবে এবং তার নেতৃত্ব করবেন ডক্টর গ্রীণ শুনে অরুণাংশু খুশী হয়ে উঠেছিল। ও ঠিকই বুঝেছিল যে, ডক্টর গ্রীণ ওকে রেখে কিছুতেই যাবেন না। আর এই সুযোগে ও বরফের দেশটা ঘুরে আসতে পারবে।

সরকারী দলে একজন বিদেশী তরুণকে অন্তর্ভুক্ত করানর প্রস্তাব নিয়ে ডক্টর গ্রীণকে অনেক চেষ্টা করতে হল। আর একমাত্র তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় একজন ছাত্র অরুণাংশু সহকারী হিসাবে দলে স্থান লাভ করল।

ওদের উড়ো জাহাজখানা একটানা গর্জন করতে করতে উড়ছিল।

(ক্রমশঃ)

রেঙ্গুনে একদিন সন্ধ্যায়

॥ যাদুকর এ. সি. সরকার ॥

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা আমার জীবন। দেশ-বিদেশের নানা পরিবেশে নানা জাতির দর্শক আর সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি কতবার। ঘর ছেড়ে বহু দূরেও যেমন যেতে হয়েছে, তেমনি আবার ঘরের কাছের দেশগুলোতেও পাড়ি জমাতে হয়েছে অনেক অনেকবার। মিতালী হয়েছে অনেকের সঙ্গে। নিকটতম প্রতিবেশী শ্যাম আর ব্রহ্মদেশের মানুষের সঙ্গে যেমন পরিচয় হয়েছে, তেমনি পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি সুদূর বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, রুশ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকের সঙ্গে। আমার অদ্ভুত পেশাই আমাকে দিয়েছে এই অপূর্ব সুযোগ।

যাদুকর জীবনের প্রথম দিকে একবার যাবার সুযোগ ঘটেছিল বর্মাদেশের রাজধানী রেঙ্গুন শহরে। প্যাগোডা, ফুঙ্গী আর নাপ্পির দেশ বর্মা। তোমরা তো সবাই জানো এ দেশের কথা।

সে সময়ে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন বর্মা মুলুকে। রেঙ্গুন শহরেও ছিলেন অনেক বাঙ্গালী। সংবাদপত্রের কল্যাণে আমার নাম প্রবাসী বাঙ্গালীদের অনেকেরই অজানা ছিল না। আমাকে কাছে পেয়ে তাই মেতে উঠলেন অনেকে। একদিন সন্ধ্যায় আমার সম্মানে এক ভোজ-সভার আয়োজন হল। আমন্ত্রিত হয়ে অনেক সম্ভ্রান্ত বর্মী ভদ্রলোকও এলেন অনুষ্ঠানে। আমাকে সম্মান জানানোর জন্য এক নাতিদীর্ঘ অনুষ্ঠানের পর শুরু হল ভোজ। ভোজের শেষে বাইরের অভ্যাগতরা চলে যেতে উদ্যোক্তাদের কয়েকজন আমাকে ধরে বসলেন একটা ম্যাজিক দেখাতেই হবে। আমরা তখন এক ভদ্রলোকের বাড়ীর ড্রইংরুমে বসে কফি পান করছি। ম্যাজিক দেখানোর অনুরোধ আসাতে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম ঘরে ম্যাজিক দেখানোর মত কোন মালমসলা পাওয়া যায় কিনা। ঘরের কোণে ডেস্কের উপরে দেখতে পেলাম একটা রংপেন্সিলের বাক্স। সেদিকে আমার দৃষ্টি পড়তে উদ্যোক্তাদের একজন বলে বসলেন, "নিন যাদুসম্রাট, এই রংপেন্সিল দিয়েই কিছু দেখান।"

রংপেন্সিল দিয়ে ম্যাজিক! অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা খেলা ঠিক করে নিলাম। আমি উঠে ঘরের কোণে চলে গেলাম তার পরে বললাম, "এই রঙের বাক্স থেকে আপনাদের পছন্দমত যে কোন রঙের একটা পেন্সিল কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিন। আমি না খুলেই বলে দেব কোন রঙের পেন্সিল আপনারা কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়েছেন।"

আমার কথা শেষ হতেই উদ্যোক্তাদের একজনের এক বর্মী বন্ধু উঠে গিয়ে রংপেন্সিলের ভেতর থেকে একটা তুলে নিয়ে কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিলেন। আমি কাগজে মোড়া পেন্সিলটা হাতে ধরে আমার শরীরের পেছনে নিয়ে গেলাম, তারপরে ডান হাতে ধরে কাগজমোড়া পেন্সিলটা শরীরের পেছনে রাখা অবস্থাতেই বাঁ হাত সামনে এনে দুবার কপালে টোকা দিলাম আর সবাইকে অবাক করে বলে উঠলাম, "বন্ধুগণ, আপনারা একটা নীল রঙের পেন্সিল কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়েছেন।"

এর পরে পর পর তিনবার সাফল্যের সঙ্গে দেখালাম খেলাটা। দর্শকেরা সবাই আমার এই অলৌকিক ক্ষমতার প্রশংসা করতে থাকলেন। বর্মী ভদ্রলোকটি তো এত মুগ্ধ হলেন যে এর পর থেকে প্রতিদিন একবার করে আমার হোস্টেলে এসে আমার খোঁজখবর নিতে লাগলেন নিয়মিত ভাবে।

কেমন করে এই অদ্ভুত খেলাটা দেখিয়েছিলাম সেই কথা এবার বলি শোন। কৌশল খুব সহজ। পেন্সিল হাতে ধরে শরীরের পেছনে নিয়ে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে আমি কাগজের মোড়ক খুলে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপরে পেন্সিলের দাগ কেটে নিয়েছিলাম। বাঁ হাত সামনে এনে কপালে টোকা দেবার ছলে নখের উপরে লাগানো দাগ দেখে বুঝে নিয়েছিলাম পেন্সিলের রঙ। বুঝলে তো?

চেষ্টা করে দেখ তোমরাও দর্শকদের অবাক করতে পারবে এ খেলা দেখিয়ে।

জাতক কাহিনী

॥ জয়ন্তী সেন ॥

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তাঁর সুখের ঘর ছেড়ে কাঁটা-বিছানো দুঃখের পথ মাড়িয়ে কত না কষ্টের শেষে তবে বুদ্ধত্ব বা পরম জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন—সে গল্প তোমরা সবাই জানো। জীবনে সুখের পাশে দুঃখ, কালোর পাশে আলো, ভালোর পাশে মন্দ। আর মানুষের মনের জগতে এই ভালো-মন্দের অহর্নিশি লড়াই চলেছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভালোর কাছেই মন্দকে হার মানতে হয়। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রূপ পাওয়ার আগে বোধিসত্ত্বকে আরও বহুবার নানা রূপে নানা দেশে জন্ম নিয়ে পুণ্য আহরণ করতে হয়েছে। সেসব জন্মের ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই, যা মঙ্গল, ন্যায়, অথবা সত্য, তারই জয় হবে। শেষজীবনে যেমন দেবদত্ত ছিলেন সিদ্ধার্থের পরম শত্রু, তেমনি জাতক কাহিনীর নায়কেরও সহচর হয়ে জন্ম নিতো অমঙ্গলকারক অসৎ বা পাপাচারী কোন মানুষ। তার পাশাপাশি থেকেও ভালো কাজ করে বোধিসত্ত্ব আমাদের জন্য অনেক সৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

তারই একটি গল্প আজ তোমাদের বলি।

সে অনেক—অনেক কাল আগেকার কথা। আজকের দিনের চার কল্প আগে পাটলীপুত্র নগরের ধারে সেরিব নামে একটি রাজ্য ছিলো। ভারী মনোরম সুন্দর সেই রাজ্য। একধারে বয়ে চলেছে তেলবাহন নদী। এই নদীটি পেরোলে ওপারে আরও একটি প্রকাণ্ড নগর, তার নাম অন্ধপুর নগর।

সেরিব রাজ্যে অতি গরিব ঘরে বোধিসত্ত্ব জন্ম নিলেন। সে ঘরে পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষার চলন নেই। মাথায় করে তামা-পেতলের কলসী বিক্রী করে অতি সামান্য রোজগারে তাদের দিন কাটে। কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ না-ই বা মিললো, বোধিসত্ত্ব কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা। কারো প্রতি হিংসা নেই, কাউকে কখনো মিথ্যা কথা বলে ঠকাতে চেষ্টাও করেন না। নিজের অবস্থায় তিনি সদা সর্বদা সন্তুষ্ট। লোকে অবশ্য বোধিসত্ত্ব নামটি জানে না, তারা তাঁকে ডাকে 'সেরিবাণ' বলে। ছোট থেকেই তিনি বাপ-ঠাকুর্দার ব্যবসা শিখে তারপর ফেরিওয়ালার মত মাথায় কলসীর বোঝা চাপিয়ে নগরে নগরে বিক্রী করতে যেতেন।

বোধিসত্ত্বের আর এক ব্যবসায়ী বন্ধু ছিলো, নাম তার সেরিবা। এ লোকটি কিন্তু মোটেও সুবিধার নয়, স্বভাব চরিত্রে তার যথেষ্ট দুর্নাম শোনা যেতো। সকলেই জানতো সেরিবা লোভী, ধূর্ত ও মিথ্যাবাদী। নিজের স্বার্থের জন্য সে যে কোন দুষ্কর্ম করতে পিছপাও হয় না। একই নগরে দুটি মানুষ এক ব্যবসা করে, অথচ মহৎ চরিত্রগুণে বোধিসত্ত্ব কখনও তাঁর বন্ধুকে এতটুকু হিংসা করতেন না।

আগেই বলেছি তেলবাহন নদীর ওপারে অন্ধপুর নগর। এই নগরের রাস্তার দুধারে বড় বড় সাতমহলা বাড়ী, সামনে সুন্দর উদ্যান। এই সব বাড়ীতে ধনশালী শ্রেষ্ঠীরা বাস করেন। নিজের

রাজ্যে ব্যবসা মন্দা পড়েছে দেখে বোধিসত্ত্ব নদী পেরিয়ে অন্য নগরে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবেন মনে মনে ঠিক করলেন। কিন্তু একা নয়। তাঁর ইচ্ছা সেরিবাও সঙ্গে যায়। আহা, দু-চারটি কলসী বিক্রী করতে পারলে ওরও উপকার হয়।

অন্ধপুর নগরের রাজপথের মোড়ে এসে দু বন্ধু দু দিকে মাথায় ফিরি নিয়ে এগিয়ে গেলো।

'বাসন চাই—বা-স—ন। পুরানো বাসন বদলে নতুন বাসন।' এমনি হাঁক শোনা গেলো প্রত্যেক বাড়ীর দরজায়। কেউ বা একবার তাকিয়ে দেখে, কেউ বা মুখ ফিরিয়ে নেয় তখুনি। কিন্তু সেরিবার ভাগ্য মন্দ, বিক্রী আর হয় না। শেষকালে ধনীর প্রাসাদের সারি ছাড়িয়ে অনেক দূরে একটি পুরানো জীর্ণ ভাঙাচোরা বাড়ীর সামনে সেরিবা যখন ক্লান্ত সুরে ডাক দিলো, দরজার ওদিকে একটি ছোট মুখ উঁকি দিয়ে তাকে যেন ইসারায় ডাকলো।

'বাসন নেবে খুকী? এই যে, এই জলের কলসীটা কেন। খুব হাল্কা, আর কেমন সোনার মত চকচক করছে।'

'আমাদের তো পয়সা নেই।'

'তবে', সঙ্গে সঙ্গে সেরিবার কপালে ভীষণ বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে।

'রাগ কোরো না ভাই বাসনওয়ালা। আমরা বড় গরিব। ঠাকুর্দা আমার বাবাকে নিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে ব্যবসা করতে গেছলেন। সর্বনাশা ঝড়ে আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেলো। তুমি যে বলছিলে পুরানো জিনিস বদলে নতুন জিনিস দেবে। আমার কলসীটা ফুটো হয়ে গেছে তার বদলে আমাকে একটা নতুন ঘড়া দেবে?'

সেরিবা অপ্রসন্ন চিত্তে নিজের কপালের দোষ দিতে দিতে মেয়েটির পিছু পিছু ফটক দিয়ে ঢুকলো। বাগান নেই, তার বদলে চারদিক আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ভরা। বাড়ীর ভেতর দালান প্রকাণ্ড বড়, কিন্তু এখানে ওখানে ভেঙে পড়ছে। দেখেই বোঝা যায় এককালে অবস্থাপন্ন লোক ছিলো এরা, লক্ষ্মীমন্ত সে সবদিন কোথায় চলে গেছে। এখন একটা পুরানো কঙ্কালের মত পড়ে রয়েছে বিশাল একটা বাড়ী। আর কোথাও কেউ নেই।

সেরিবা দেখলো ছোট্ট মেয়েটি একটা মস্ত বড় কলঙ্কধরা ক্ষয়ে যাওয়া কলসী অনেক কষ্টে টেনে টেনে নিয়ে আসছে।

'বাসনওয়ালা, তুমি ভাই এটা নিয়ে আমায় ঐ কাঁসার ঘড়াটা দেবে? দেখো না, পুরানো হলেও এটা খুব ভারী।'

সেরিবার চোখ দুটোয় লোভের আগুন ছুরির ফলার মত চিকচিক করে উঠলো। কলসীটা সাবেক আমলের, গলিয়ে ফেললে বেশ খানিকটা ধাতু পাওয়া যাবে।

একটুও গরজ না দেখিয়ে ভুরু কুঁচকে সেরিবা কলসীটা হাতে তুলে নিলো। আসলে ও মতলব এঁটেছিলো কোন দাম না দিয়েই পুরানো কলসীটা বাগিয়ে নেবে।

'কি ভাবছ বাসনওয়ালা —মেয়েটি করুণ চোখ মেলে তাকালো। 'পেতলের ঐ ছোট ঘড়াটা পেলে কুয়ো থেকে জল তুলতে কি সুবিধাই না হোতো!'

'এ কলসীটা একেবারে পুরানো হয়ে গেছে। এর আসল দাম কি, এক কাণাকড়িও নয়।'

লাঠি ভর দিয়ে এক বুড়ী এগিয়ে আসছিলো। বোধ হয় মেয়েটির ঠাকুমা। শাঁখের মতো সাদা গায়ের রঙ। হাবভাবে বোঝা যায় বড় ঘরের মানুষ, কিন্তু পরণের কাপড়টি পর্যন্ত শতছিন্ন।

'তুমি ঠিক বলছ বাসনওয়ালা'– কাঁপা কাঁপা গলায় বুড়ী বললো—'এ জিনসটা কিন্তু আমার শ্বশুরের আমলের। তিনি ছিলেন অন্ধপুর নগরের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী। কাজেই আমার মনে হয়, এটা খুব খেলো হবে না।'

'না, না, পয়সা দিয়ে এই মান্ধাতা আমলের জিনিস কে নেবে? বরং অমনি যদি দাও, তবে দয়া করে নিয়ে যেতে পারি। জঞ্জাল ছাড়া এটা আর কিছু নয়।'

ঝুড়ি মাথায় তুলে মেজাজ দেখিয়ে সেরিবা সেখান থেকে চলে গেলো। আর একটু বাদে ঘুরে এসে দু-চার পয়সা দিয়ে নিয়ে গেলেই চলবে। ছলছল চোখে মেয়েটি তাকিয়ে রইলো তার দিকে। পুরানো কথা মনে করে বুড়ীর গাল বেয়েও গড়িয়ে পড়ছে চোখের জলের ধারা।

একটু পরেই কিন্তু উল্টো দিকের রাস্তা দিয়ে বোধিসত্ত্ব সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথায় সেই কলসী-ঘড়া-বোঝাই ঝুড়ি।

মেয়েটি কিছুক্ষণ দ্বিধা করলো। কি জানি, এও যদি পুরানো কলসীটার বদলে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করে।

'কিছু চাই মা?' শ্রান্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বোধিসত্ত্ব মিষ্টি করে হাসলেন।

'এই কলসীটা নেবে বাসনওয়ালা?'—ভরসা পেয়ে মেয়েটি এগিয়ে এলো সামনে, 'সামান্য কিছু দাম পেলেও আমাদের বড় উপকার হয়।'

বোধিসত্ত্ব কলসীটা হাতে নিয়ে চমকে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে একরাশ বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠলো। কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

'এর কি কোনই দাম নেই বাবা?' বুড়ী ছেঁড়া আঁচল দিয়ে চোখ ঘষতে লাগলো।

'দামের কথা পরে হবে। আগে বলুন, এ বাসন আপনি কোথায় পেলেন। এ যে সোনার তৈরী!'

'সে কি!' মেয়েটি সব ভুলে চিৎকার করে উঠলো—'তবে যে তোমার মত এক ফেরিওয়ালা একটু আগেই বলে গেলো এর দাম এক কাণাকড়িও নয়!'

বোধিসত্ত্ব হাসলেন। সেরিবার চরিত্র তাঁর অজানা ছিলো না। লোভের তাড়নায় সে এই অসহায় দুটি প্রাণীকে ঠকিয়ে একেবারে বিনামূল্যে সোনার কলসী লাভ করতে চেয়েছিলো। অতি লোভ করা অন্যায়। তাতে পরিণামে ঠকতেই হয়।

'কত দাম দেবে বাসনওয়ালা?' মেয়েটি খুশী-ভরা চোখে বলে উঠলো।

'এর উচিত দাম দিতে পারি, সে সাধ্য আমার নেই। তবে আমার এই সব বাসন তোমাকে দিয়ে দিলাম। তা'ছাড়াও আমার কাছে পাঁচশ' কাহন আছে, এই নাও মা।'

সামান্য কিছু টাকা নিজের কাছে রেখে যা ছিলো সব ওদের হাতে তুলে দিয়ে বোধিসত্ত্ব সোনার কলসী নিয়ে সেরিব নগরে ফিরে গেলেন।

আর লোভী সেরিবার কি হোলো বুঝতেই পারছ। সে বুঝতে পারেনি কলসীটা সোনার। বোধিসত্ত্ব মাত্র পাঁচশ' কাহন দিয়ে সোনার কলসী পেলো। আর সে নিজের বোকামীর জন্য অতিরিক্ত লোভ করে নিজের সৌভাগ্যকে এমনি করে পায়ে ঠেলে বিদায় করলো। এর চাইতে অন্ততঃ একশ' মুদ্রা দিয়েও যদি তখুনি সে ওটা কিনে নিতো।

দুঃখে অনুশোচনায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে মাথার চুল ছিঁড়ে সেরিবা বহুকাল নিদারুণ মনের কষ্টে দিন কাটালো।

[সেরিবাণিজ জাতক অবলম্বনে]

ছড়া

॥ শ্রীমতী ॥

বিক্রমসিংহের বাস ছিল দিল্লী,
পুষেছিল বিক্রম পেশোয়ারী বিল্লী।
কলকাতা এসে দেখে মাছ নেই,
কিছু নেই। বিল্লী অবুঝ, তাই
বিল্লী ও বিক্রম চলে গেল সিল্লী।

সিমলাতে বাস সাতপুরুষের। সাধুচরণ সমাদ্দার
হালে সে এক মস্ত বাগান জমা নিল নালন্দার।
ঝুড়িভরা টসটসে আম
বেচলে পাবে বেশ কিছু দাম।
ত্রিকূট থেকে তড়িৎগতি চলে এল খরিদ্দার।

চাঁদনী রাতে রতা নামের একটি চালাক শেয়াল
ভাঙ্গাবাড়ীর জঙ্গলেতে গাইছে বসে খেয়াল।
মনের সাধে—গিটকিরিতে
উঠলো রতা এমনি মেতে
সাপট, তানের ধমকানিতে পড়লো চাপা দেয়াল।

দি বেট

॥ পার্থসারথি গুপ্ত (গ্রাঃ নং ১৯৪০৬) ॥

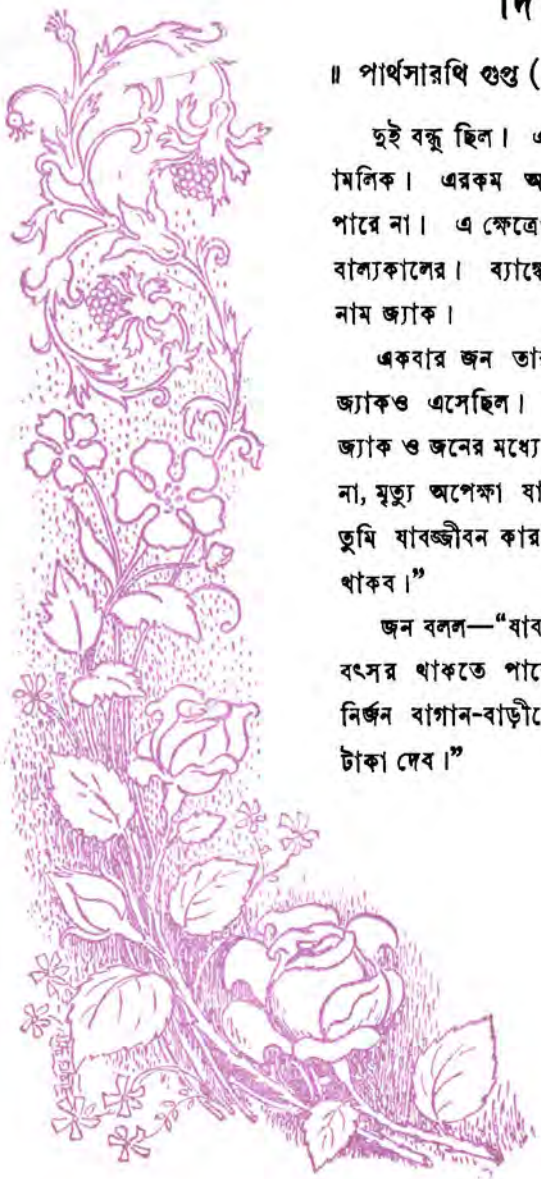

দুই বন্ধু ছিল। একজন দরিদ্র উকিল, অপরজন এক ব্যাঙ্কের মালিক। এরকম অবস্থায় কখনো প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাদের বন্ধুত্ব ছিল মাত্র বাল্যকালের। ব্যাঙ্কের মালিকের নাম ছিল জন এবং উকিলের নাম জ্যাক।

একবার জন তার জন্মদিনে তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করল। জ্যাকও এসেছিল। খুব গল্পগুজব হল। হঠাৎ কথায় কথায় জ্যাক ও জনের মধ্যে তর্ক হল। জ্যাক বলল, "না কখনোই না, মৃত্যু অপেক্ষা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শ্রেয়। আমাকে যদি তুমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাও তা হলেও আমি আরামে বেঁচে থাকব।"

জন বলল—"যাবজ্জীবন তো দূরের কথা, তুমি যদি পনেরো বৎসর থাকতে পারো—তাও আবার কারাগারে নয়, এক নির্জন বাগান-বাড়ীতে তবে তোমাকে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব।"

জ্যাক ভাবল যদি মরে যাই ক্ষতি নেই, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে বাকী জীবনটা আরামে কাটাতে পারব। জ্যাক রাজী হয়ে গেল।

ঠিক হল যে জনের এক নির্জন বাগান-বাড়ীতে জ্যাককে রাখা হবে। শর্ত—জ্যাক কোন মানুষের মুখ দেখতে পারবে না, কিন্তু যখন যে বই চাইবে বা অন্য যা কিছু চাইবে তা সে পাবে।

কিন্তু এমন কোন বই তাকে দেওয়া হবে না যাতে বর্তমান সংবাদ আছে কিংবা খবরের কাগজও সে পাবে না। খাবার তাকে জানলা দিয়ে দেওয়া হবে।

জ্যাককে নির্দিষ্ট দিনে সেই বাড়ীতে আসতে হল।

সে প্রথমেই হুকুম করল, "যত উপন্যাস বই আছে নিয়ে এস।

হাজার তিনেক বই এসে গেল। জ্যাকএর উপন্যাস পড়ে একবৎসর কাটিয়ে দিতে অসুবিধা হল না। এবার চাইল সে ডিটেকটিভ বই। তাও সে পেল। আরও এক বৎসর কেটে গেল। এরপর জ্যাক কবিতা, নভেল, অনুবাদ বই পড়ে তিন বৎসর কাটিয়ে দিল।

এবার সে গীটার শিখতে ইচ্ছা করল। গীটার এবং গীটার শেখার বই এল। কিছুদিনের মধ্যেই সে পারদর্শী গীটার-বাদক হয়ে উঠল। এমনি করে পিয়ানো, বেহালা, পিয়ানো একর্ডিয়ান শিখতে শিখতে আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেল।

রইল বাকী পাঁচ। এবার জ্যাক ভাষা শিক্ষা করতে ইচ্ছা করল। বিভিন্ন ভাষার বই এল।

প্রায় পনেরো বৎসর যখন কেটে গেল, তখন জ্যাক হল ছয়টি ভাষায় সুপণ্ডিত। সে একটা ছোট গল্প লিখে সেটি ছয়টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বলল যে যাঁরা এইসব ভাষা জানেন তাঁদের যেন লেখাগুলি দেখানো হয়। তাঁরা যদি লেখাগুলিকে নির্ভুল স্বীকার করেন তবে যেন বাইরে আমার জন্য কামান দাগা হয়।

সত্যিই কামান গর্জন শোনা গিয়েছিল। এদিকে যখন মেয়াদ পূর্ণ হতে মাত্র একমাস বাকী জ্যাক পাগলের মতো হয়ে গেল। কিছুতেই মন বসে না। একবার সে বাজনা বাজায়, পরক্ষণেই বই নিয়ে বসে।

এদিকে জনেরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে। যে জনের কাছে একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা সামান্য ছিল আজ যদি তাকে তা দিতে হয় তবে সে পথে বসবে। এই মনে করে সে এল জ্যাককে খুন করতে। কিন্তু এসে দেখে জ্যাক ঘুমোচ্ছে, আর তার মাথার কাছে রয়েছে ছোট্ট একটা চিঠি—"আজ রাত্রেই আমি চলে যাব, কারণ আজই আমার পনেরো বছর শেষ হবে। আমি টাকার লোভে এই বাজীতে রাজী হয়েছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি এই সময়ে যা শিখেছি তা কেউ ত্রিশ বছরেও শিখতে পারবে না।" চিঠি পড়ে জন ফিরে এল।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সেই রাত্রেই জ্যাক পালিয়েছিল। সে বাজী জিততে পারল না বটে, কিন্তু এক অমূল্য সম্পদ সে আহরণ করল যার তুলনা নেই।

[বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে]

নববর্ষে

॥ স্বরূপকান্তি মুখোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং ১৯৮০১) ॥

বর্ষশুরু গোড়ায় তোমায়
জানাই আমার সম্ভাষণ,
"সুন্দর হোক্, নির্মল হোক্—
নূতন বছর, নূতন ক্ষণ।
নূতনেরই জয়ধ্বনি
ব্যর্থ আশার শেষ রাগিণীর
লেশটুকু নিক হরে—
সফলতার মধুর বাণী
ভরিয়ে তুলুক সকল প্রাণ-ই,
আনন্দবান ডাকুক এবার
সবার ঘরে ঘরে ॥"

জন্মদিন

॥ কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং ১৯৯২০) ॥

আজ রজতের জন্মদিন। তাই একটু সকালেই ঘুম থেকে উঠেছে সে। উঠেই রোজকার অভ্যাসমত একটু বেড়াতে বের হয়। পথে দেখা হয় রজতের বন্ধু নির্ম্মলের সঙ্গে। "কি রে! আজ এতো ভোরে উঠেছিস যে, সূর্য্য ওঠার আগে তো কোনদিন ঘুম ভাঙে না তোর?" প্রশ্ন করে নির্ম্মল।

"আজ যে আমার জন্মদিন।" উত্তর দেয় রজত।

নির্ম্মল বলে, "জানিস আজ আমরা আগ্রা যাচ্ছি দাদার বিয়েতে, বরযাত্রী হয়ে। এই দিনটির জন্য কত আগ্রহ নিয়ে এতদিন প্রতীক্ষা করেছিলাম।" তারপর একটু থেমে বলে, "আজ তোর জন্মদিন। কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ খাওয়া হল না। আমরা তো সাতটার সময় চলে যাচ্ছি। আগ্রা থেকে ফিরে এলে একদিন খাইয়ে দিস কিন্তু।"

হেসে সম্মতি জানায় রজত। তারপর নির্ম্মল চলে যায় বাড়িতে, রজতও বাড়ির দিকে পা চালায়। গেটে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ে রজত। গেটের পাশের গোলাপ গাছটায় আজও ফুটেছে একটা রক্তগোলাপ, যে কথাটা রজত প্রাণপণে ভুলে থাকতে চায় সেই কথাটাই তার বারবার মনে

পড়ছে কেন? কেনই বা আজ এই রক্তগোলাপটা ফুটেছে? ছুটে পড়ার ঘরে ঢোকে রজত। একটা বইয়ের ভিতর থেকে বার করে অতি যত্নে রাখা পুরাণ, বিবর্ণ একখানি ছবি। রজতের বোন বাবলীর ছবি। সেও যেন আজ ছবির ভেতর থেকে বলছে ডাকছে, "দাদাভাই, আজ যে তোমার জন্মদিন। আমার তো নিমন্ত্রণ খাওয়া হল না।" অনেক দিন আগেকার কয়েকটি ছবি ভেসে ওঠে রজতের মনে। বাবলী! চার বছরের ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটা সারাক্ষণ হৈ চৈ করে মাতিয়ে রাখত বাড়িটাকে। মনে পড়ে সেদিনের কথা, আজ থেকে ঠিক দু' বছর আগেকার ঘটনা।

* * * *

সেদিনও বেড়িয়ে বাড়ি ফিরল রজত। আদরের বোন বাবলী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কোলে।

—"বল ত দাদাভাই তোমার জন্মদিনে আমি তোমাকে কি দেব?"

—"জানি না ত।"

—"আমি তোমাকে খুব সুন্দর একটা মালা তৈরি ক'রে দেব, তার মাঝখানে থাকবে খুব সুন্দর একটা রক্তগোলাপ, কাল ত তোমার জন্মদিন, না দাদাভাই?"

—"হ্যাঁ।"

পরদিন একটা গোলমালে ঘুম ভাঙে রজতের। বেরিয়ে এসে দেখে তার আদরের বোন বাবলী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মাথার অনেকটা কেটে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে ব্যাপারটা জানতে পারল রজত। বাবলী ভোরবেলা গেটে উঠেছিল রক্তগোলাপ গাছ থেকে ফুল পাড়বে বলে। সেখান থেকে পড়ে এই অবস্থা। গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বেলা ন'টার সময় সবাইকে ছেড়ে চলে গেল বাবলী।

* * * সাতটা বাজে, সম্বিত ফিরল রজতের। হাতের ছবিটা ঢুকিয়ে রাখে বইয়ের মধ্যে। নির্ম্মলদের বাড়ি থেকে তখন ভেসে আসছে শুভ যাত্রার শঙ্খধ্বনি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। রামমোহন রায়

[পৃথিবী—ধরা, সোনা—হেম, আনন্দ—আমোদ, অশ্ব—হয়, অগ্নি—আগুন, সমুদ্র—পারাবার, স্বর্গ—অমরালয়]

২। কেশব

বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্থানাভাব বশতঃ উত্তরদাতাদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

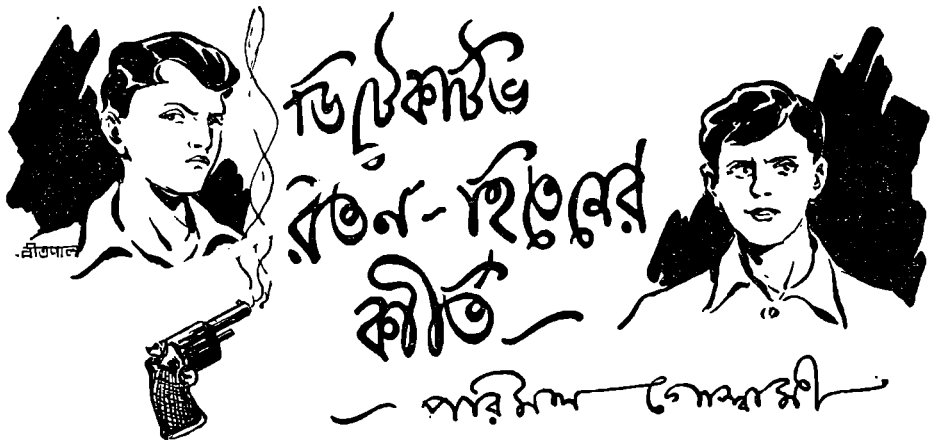

[পূর্বকথা—রতন এবং হিতেন শখের ডিটেকটিভ। তারা ব্রজবিলাসের শিষ্য। শ্রীমতী নর্ম্যা মর্গ্যানের গয়নার বাক্স চুরি গেছে। সে খবর পেয়ে রতন আর হিতেন মর্গ্যান সাহেবের বাড়ি গিয়ে তদন্ত শুরু করল। হারানো গয়নার বাক্স খুঁজে দেবে তারা। পুলিস ইতিমধ্যেই বাড়ির ড্রাইভার, মালী, বেয়ারা সকলের জবানবন্দী নিয়েছে। রতন আর হিতেন লক্ষ্য করে দেখল, মেমসাহেবের ড্রেসিংরুম থেকে শুধু গয়নার বাক্সই যে চুরি গেছে তা নয়, তাঁর চমৎকার আয়নাটিও কারা যেন ফ্রেম থেকে খুলবার চেষ্টা করেছে।

সত্যিকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তি তা হলে কে? গুরুদেব ব্রজবিলাস তাদের পরামর্শ দিল মর্গ্যান সাহেবের পাশের ভাঙ্গা বাগান-বাড়িটিতে গিয়ে চুপচাপ এবাড়ির প্রতি লক্ষ্য রাখতে। রতন আর হিতেন পোড়ো বাড়িতে রাত কাটাতে গেল। সে রাতে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হল। তাছাড়া নানা রকম অদ্ভুত আওয়াজও শোনা গেল এবং কি আশ্চর্য—পরদিন সকালে মেমসাহেবের হারানো গহনার বাক্স পাওয়া গেল একটা গাছের নীচে। তারপর···]

—বারো—

সমস্ত বাড়িতে একটা ভীষণ উত্তেজনা। তারপর প্রথম বিস্ময় একটুখানি কেটে গেলে আবার সেই প্রশ্ন—এ কি করে হল?

ঐ বাড়িতে কি চোর ছিল?

চোরদের সঙ্গে কি খুব লড়াই করতে হয়েছিল?

ঝড়ের রাত্রে চোর ধরলে কি করে? চোর কি বেঁচে আছে এখনও?

চোর একজন, না অনেক? চোর কি ঐ ভাঙা বাড়িতে বাস করত?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কিন্তু রতন আর হিতেন সব প্রশ্নের উত্তরেই একটা রহস্যপূর্ণ হাসি হাসতে লাগল। অবশেষে বলল, কাল সকালে এসে সব বলব, আজ আমরা বড় ক্লান্ত। সমস্ত রাত ঘুমোইনি। তবে কথা রাখতে পেরেছি, এজন্য আমরাই বেশি খুশি হয়েছি।

রাত্রের ঝড়ের চিহ্ন ওদের চেহারাতেও যেন ফুটে উঠেছে। চুল এলোমেলো, বৃষ্টির ছাটে

দামা ভিজে গিয়েছিল, তা গায়েতেই শুকিয়েছে। যেন এরা শহরের মানুষ নয়, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে অল্পক্ষণ আগে।

রতন-হিতেন কিছুতে গয়না পাওয়ার রহস্যটা মর্গ্যানদের কাছে ভাঙল না। বার বার বলল, কাল সকালে এসে সব বলব।

শ্রীমতী নর্মা মর্গ্যান ওদের চেহারা দেখে খুবই দুঃখিত হলেন, কিন্তু তিনি গয়না ফিরে পাওয়ার আনন্দে এমন পাগল হয়ে উঠেছেন যে এখন আর অন্য কিছুই ভাল লাগছে না। তিনি সাহেবকে বললেন, আহা! বেচারা দুজনকে এখন ছেড়ে দাও, কালই শোনা যাবে সব।

পথে ওদের দুজনের মধ্যে একটি কথাও হল না, সত্যিই ওরা ভীষণ ক্লান্ত ছিল তখন। একটি রাত্রির দুঃস্বপ্ন-শেষে ওরা যে বেঁচে আছে সে তো শুধু প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলেই।

ট্যাক্সিতে ফিরল বাড়িতে। দুজনে দুজনের বাড়িতে গেল। ট্যাক্সিতেও দুজনে একেবারে চুপচাপ। গত রাত্রির সবটাই স্বপ্ন। স্বপ্ন না হলে গয়না কি করে পাওয়া গেল।

ওরা যে নর্মা মর্গ্যানকে এবং উইলিয়াম মর্গ্যানকে তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলল না, তার কারণ এ নয় যে ওরা ক্লান্ত ছিল। ক্লান্ত ছিল অবশ্যই, কিন্তু আসল কারণ হচ্ছে—ওরা নিজেরাও জানে না ব্যাপারটা কি। দুজনেই গয়নার বাক্স আবিষ্কার করে একটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। আর ঠিক এই জন্যই দুজনে কেউ কারো সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে নি। কথা বলবার ইচ্ছাই হয় নি। কারণ দুজনেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুরুদেব ব্রজবিলাস সরকারের কাছে অত্যন্ত ছোট হয়ে পড়েছে। নিজেদের এই পরাজয় হজম করতে ওদের বেশ কিছু সময় লাগবে। ওদের পর্যবেক্ষণে যে কত ত্রুটি আছে—কত ফাঁক আছে, তা ওরা এই একদিনের ব্যাপারেই ভাল করে বুঝতে পেরেছে। তাই দুজনে অত্যন্ত দমে গিয়ে কেউ কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারেনি।

ওরা বাড়ি ফিরল বেলা দশটায়। তারপর স্নান-খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ল। রতন যখন দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনল তখন বিকেল সাড়ে চারটে।

হিতেনকে দেখে রতন খুশি হল। দুজনেরই ক্লান্তি এতক্ষণে অনেকটা কেটে গেছে।

হিতেন জিজ্ঞাসা করল, কাল রাত্রে কি সব অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল তা কি তুই বুঝতে পেরেছিস? গয়নার বাক্স তেঁতুল তলায় পাওয়া গেল কেন হঠাৎ? বুঝতে পেরেছিস?

তুই পেরেছিস?

না। মনে হয় চোরেরা ফেলে গেছে।

না রে। সবটাই হেঁয়ালি। কিন্তু এমন হেঁয়ালি তো কখনো দেখিনি। গুরুদেব ঐ পুরনো বাগান-বাড়ির ভাঙা ঘরে আমাদের থাকতে বললেন, তা হলে কি তিনি আগে সবই জানতেন?

জানতেন বৈ কি। তার আভাসও তো দিয়েছিলেন সেদিন। কিন্তু এ নিয়ে আমরা কেন আর মাথা ঘামাই? এ সব আমাদের বুদ্ধির বাইরে। সোজা গুরুদেবের কাছেই যাওয়া যাক।

তিনি কি বাড়িতে আছেন এখন ?

থাকুন না থাকুন, আমরা গিয়ে তো পড়ি। যদি না থাকেন বসে থাকব। যতক্ষণ না আসেন অপেক্ষা করব।

ওরা গিয়ে পৌঁছল ব্রজবিলাসের বাড়ির সম্মুখে। ঠিক সেই সময় একজন বৃদ্ধ বেরিয়ে আসছিলেন ভিতর থেকে। হিতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, মিস্টার সরকার কি বাড়িতে আছেন ?

বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ ভিতরে, তিনি তো তোমাদের জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।

ওরা বৃদ্ধকে অনুসরণ করে দোতলায় বসবার ঘরে পৌঁছল।

বৃদ্ধ বললেন, এত দেরি দেখে কাজে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমরা সকালে মর্গ্যান সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়েছ।

রতন হিতেন দুজনেই এতক্ষণে ব্রজবিলাসকে চিনতে পেরে প্রণাম করল।

ব্রজবিলাস বলল, মর্গ্যান সাহেবকে টেলিফোন করে সবই জেনে নিয়েছি। খুশি হয়েছি শুনে যে তোমরা গয়না উদ্ধার করেছ।

রতন বলল, আমরা এত কষ্ট করেও যা জানতে পারিনি, আপনি ঘরে বসে তা জানলেন কি করে ?

হিতেন বলল, সবটাই হেঁয়ালি বোধ হচ্ছে। আর ভাবতে গেলে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আপনি সব খুলে বলুন।

ওরা সবাই চেয়ারে বসেছে ততক্ষণে। ব্রজবিলাসের আদেশে ওরা দুজনে গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা পরপর বলল। ব্রজবিলাস সব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে বলতে আরম্ভ করল—দেখ রতন, হিতেন, তোমাদের অনুমানে যে সব ফাঁক ছিল, তা তো আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু সেই সব ফাঁক যদি নাও কত, তা হলেও একটা জিনিস তোমরা কিছুতে বুঝতে পারতে না যে, আয়নাটা টেবিলের ফ্রেম থেকে কে খুলে নিতে চেষ্টা করেছে এবং কেন করেছে। এইখানে এসে তোমাদের অ্যানাগ্রাম আটকে গেছে। যতবার ৬ যেতে ততবার আটকে যেত। মনে আছে তো, ANGER পেয়েছ, T পেয়েছ, কিন্তু GARNET হ না।

আমি মর্গ্যান সাহেবের বাড়ি ও তার আশে-পাশের জায়গা খামাত্র বুঝতে পেরেছিলাম সব। বুঝেছিলাম যে, এটি হনুমানের কীর্তি।

রতন-হিতেন এক সঙ্গে বলে উঠল, "অ্যাঁ!" তারপর স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ থেকে রতন হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আয়না ?

বলছি। তোমরা জান না, হনুমানদের আয়নার প্রতি ভীষণ লোভ। হনুমান মর্গ্যান সাহেবের বাগানে লাফিয়ে বেড়াবার সময় ঐ আয়না দেখতে পায়, এবং ঘরে লাফিয়ে ঢুকে ওটাকে টেনে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু না পেরে গয়নার বাক্সে খাবার মিলতে পারে ভেবে ওটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ওতে যে চিহ্ন দেখেছ, তা ঐ হনুমানের, মালীর নয়। হাতের ছাপ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তা ভিন্ন আমি ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি পুরনো বাগান-বাড়িটাতে অনেকগুলো হনুমান বাস করে। তাই তোমাদের ঐ বাড়িতে বাস করতে বলেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমাদের খাবার চুরি করতে এলে তোমরা যখন তাড়া করবে, বা গাছে ঢিল ছুঁড়বে তখন ওরাও তার অনুকরণে তোমাদের দিকে কিছু ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করবে। তখন ঐ বাক্সটি হয় তো ছুঁড়ে মারতে পারে। কিন্তু তা আর করতে হয় নি, তোমাদের খাবার ওরা ভোরবেলা চুরি করেছে, তোমরা তখন ঘুমিয়েছিলে। আর প্রথম দিনেই যে ঝড় উঠবে, এবং কোনো ডালের গোড়ায় হাল্কা ভাবে রাখা বাক্সটি নিচে পড়ে যাবে এতটা আমিও ভাবি নি। দু-তিন দিন থাকলে বাক্সটির সন্ধান পাবে, এইটে অনুমান করেছিলাম।

কিন্তু যদি দৈবাৎ ঝড় না হত, এবং আমরা যদি হনুমানকে ঢিল ছুঁড়ে মারার চেষ্টা না করতাম, তা হলে কি হত ?—জিজ্ঞাসা করল রতন।

ব্রজবিলাস বলল, সেটাও ভেবে রেখেছিলাম। ও রকম হলে, আমি তোমাদের অন্য নির্দেশ দিতাম। তখন বলতাম, মর্গ্যান সাহেবকে বলতে যে, ঐ বাগান-বাড়ির গাছ এবং জঙ্গল সন্ধান করা দরকার—সেজন্য কয়েকজন লোক চাই। গাছে এবং জঙ্গলে তন্নতন্ন করে সন্ধান চালালে নিশ্চয় গয়নার বাক্স উদ্ধার হত। বাক্সটা যে হনুমানেই চুরি করেছে এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। আর হনুমান যদি নিয়ে থাকে, তবে ঐ বাগান-বাড়ি ছেড়ে সে কোথাও যায় নি, এই ছিল আমার হিসাব। হিসাব মিলেও গেল। অবশ্য হনুমানের আয়নার প্রতি টান আছে এটা জানতাম বলেই অনুমান করা আরও সহজ হয়েছিল। হাতের ছাপ, আর আয়নার দিকে টান, এ দুটি একত্র করলে দুই আর দুই চার হওয়ার মতন যোগফলটা সোজা হয়ে পড়ে।

রতন-হিতেন চুপ করে কথাগুলো শুনল। আর অবাক হ'. না, আর বিস্ময় প্রকাশ করল না। মাথা নিচু করে শুধু ভাবতে লাগল।

ব্রজবিলাস বলল, আমি এবারে চলি হে, তোমরা বসে সব ঘটনা আবার মিলিয়ে ভাবতে থাক।

রতন চমকে উঠল সে। বলল, না না, আমরাও উঠব এখন। শুধু বলে যান, মর্গ্যান সাহেবের বাড়ি গিয়ে এ আমরা কি বলব। সব কথা খুলে বলব কি?

ও, হে একটা সমস্যা বটে। আমার মনে হয় রহস্যটা রহস্যই থেকে যাক, সাহেবদের কাছে এখন কিছু বলে দরকার নেই।—

ব্রজবিলাস এ বিষয়ে আরও কয়েকটি উপদেশ দিয়ে পথে এসে পড়ল এবং জনসমুদ্রে দেখতে না দেখতে কোথায় মিলিয়ে গেল।

তখন রতন বলল, ঐঃ যা! ঝড়ের মধ্যে ঐ বাড়িতে যে দৈত্যের মতন চেহারা দেখলাম সে কার, তা তো জিজ্ঞাসা করা হল না? কারা যেন বাগানে দাপাদাপি করে ফিরল, তাও তো জানা গেল না। গুরুদেব নিশ্চয় ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

হিতেন বলল, ঐ সময়ে হয় তো হনুমানরাই ঝড়ের জন্য ছুটোছুটি করে থাকবে। তা ছাড়া আর কি হতে পারে?

ওরা পরদিন মর্গ্যান সাহেবের বাড়িতে গেলে ওদের নিয়ে প্রায় উৎসব পড়ে গেল। দুজনে যে কত আদর আর প্রশংসা পেল তা আর বলা যায় না। কত রকমের খাবার।

মর্গ্যান সাহেব আর তাঁর মেমসাহেব এবারে উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, এইবার সব বল তোমরা। কি করে গয়না পেলে?

রতন বলল, আমরা যে কথা দিয়েছিলাম, তা রেখেছি—বাস্। কি করে গয়না পেলাম সে কথা এখন গোপন রাখতে চাই। তবে এইটুকু জানাচ্ছি যে চোর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

বেশ বেশ, যদি আপত্তি থাকে তবে শুনতে চাই না।—বললেন সাহেব। তোমাদের প্রতি আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ রইলাম। যে অসাধ্য সাধন তোমরা করেছ, তার জন্য ডিটেকটিভ হিসাবে তোমাদের কত টাকা দিতে হবে বল, এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।

রতন বলল, এ কেসে আমরা কিছুই চাই না। আমরা যেচে এসে কাজ করেছি। আমরা আনাড়ি। একেবারে নতুন। এটাই আমাদের প্রথম কেস। এতে আমরা টাকা নেব না। আপনারা আমাদের যে ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন, যা চেয়েছি দিয়েছেন, যা চাইনি তাও দিয়েছেন, স্নেহ দিয়েছেন। ঐখানেই আমাদের পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেছে।

এ কথায় আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মেমসাহেবের চোখে জল দেখা দিল। সাহেব ওদের দুজনেরই হাত একে একে সস্নেহে চেপে ধরলেন এবং দুজনকে নিজের গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

শেষ

আমরা তিনমাস হয় জাপানে এসেছি—ইতিমধ্যে জাপানের বিশটি বিভিন্ন সহরে আমাদের ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেছি। বিগত ১৯৬৪ সালেও চার মাস (ফেব্রুয়ারী থেকে মে) জাপানের সর্ব্বত্র অনুরূপ ভাবে জাপান ও ভারত সরকারের যুক্ত ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে গিয়েছি। অসম্ভব ভীড় এবং অসম্ভব চাহিদার জন্য আমরা এবারে আবার আসতে বাধ্য হয়েছি। এবারেও সেই সমস্ত সহরে (এবং আরও অনেক নূতন সহরে) আমাদের ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে এবারে সবচাইতে বড় বড় প্রেক্ষাগৃহে, এমন কি ষ্টাডিয়ামে, জিমনেশিয়ামেও 'শো' দেখানো হচ্ছে—যাতে একসঙ্গে বহু সহস্র লোক 'ইন্দ্রজাল' দেখতে পারে। মোটরগাড়ী অদৃশ্য করা প্রভৃতি বড় বড় খেলা এখানে খুব ভালই হচ্ছে। এবারেও অসম্ভব ভীড়। গত ১৭ই মার্চ্চ ফুকুই সহরের জিমনেশিয়ামে প্রতি 'শো'তে আট হাজার দর্শক আমাদের ইন্দ্রজাল দেখেছে। জাপানী পত্রিকা 'ফুকুই সিম্বুন' ১৮ই মার্চ্চ সংখ্যায় বড় বড় শিরোনামায় লিখেছে, "আট হাজার (৮০০০) লোক ভারতীয় ইন্দ্রজাল দেখেছে।" জাপানে অন্য কোনও অনুষ্ঠানে আজ পর্য্যন্ত এত জনসমাগম হয় নি। পত্রিকা লিখেছে, "পি. সি. সরকার—রূপকথার যাদুকর"। যাহা হউক ভারতের ইন্দ্রজাল জাপানে অসম্ভব সমাদর লাভ করেছে এজন্য আমরা গৌরব বোধ করছি।

আমরা সময় পেলেই এ দেশের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখতে যাই। গত ১০ই মার্চ্চ আমরা জাপানের মাৎসুয়ে সহরে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক লাফকাডিও হার্ন (LAFCADIO HEARN)-এর জাপানের বাসভূমি (গভর্ণমেণ্ট সংরক্ষিত ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থল) ও তাঁর নামাঙ্কিত মিউজিয়াম দেখতে যাই। জাপানের পত্রপত্রিকাতে আমাদের ফটোসম্বলিত সংবাদ ছাপা হয়েছে। তারা অবাক হয়েছে যে একজন যাদুকর চারদিকে এত খোঁজখবর নেয় কেন! যাদুকরের জীবনে ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য কৃষ্টিবিষয়ক ব্যাপারেও যে উৎসাহ থাকতে পারে তারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না। আমি এদেশে ইতিমধ্যে বিশটি রোটারী ক্লাবের সভায় যোগ দিয়েছি—অনেক রোটারী ক্লাবে বক্তৃতাও করেছি। এই সংবাদ জাপানের পত্রপত্রিকাতে ছাপা হয়েছে। একজন যাদুকর যে 'রোটারী ক্লাব'এর সভ্য হতে

পারে সে ধারণা এদের ছিল না। এরা যাদুকরকে সার্কাসের খেলোয়াড় বা ফুটবল, বেসবল প্লেয়ারের মত মনে করতো। কিন্তু তাদের ধারণা কদম পাল্টে গিয়েছে। তারা আমার ইন্দ্রজালে 'ভারত পরিচয়' পাচ্ছেন—দেশসেবার মহৎ আদর্শ নিয়ে গঠিত আমার 'ইন্দ্রজাল'—তাদেরকে নূতন চেতনা, নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই তারা এত ভীড় করে আমাদের খেলা দেখছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে স্বদেশী যুগে মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান—শুধুমাত্র যাত্রাগান হলে ইংরেজ সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতেন না। মুকুন্দ দাসের যাত্রাগান দেশসেবার আদর্শ নিয়ে তৈরী হয়েছিল। আমাদের ইন্দ্রজালেও সেইরূপ "রম্যানিবিক্ষ্য" সঙ্গে সঙ্গে নূতন করে 'ভারত পরিচয়' রয়েছে। তাই জাপানীরা আমাদের ইন্দ্রজালে এত ভীড় করছেন।

লাফকাডিও হার্ন মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে পি. সি সরকার

যাই হউক, আমরা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে 'লাফকাডিও হার্ন'এর লেখা পড়েছিলাম। তিনি জাপানের প্রচলিত গল্প, প্রবাদ অবলম্বন করে জাপানী ভাবধারা রক্ষা করে তাঁর রচনা প্রকাশ করে—সভ্য জগতে 'জাপান পরিচয়' করিয়ে দিয়েছিলেন। জাপান সরকার এই লাফকাডিও হার্নএর লেখার মাধ্যমে ইংরেজী ভাষাভাষীদের মধ্যে জাপানকে সুপরিচিত করার পবিত্র কার্য্যের জন্য আজ তাঁকে সম্মানিত করেছে। তাঁর বাড়ী ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যস্থল হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে—তাঁর নামে সংগ্রহশালা (মিউজিয়াম) তৈরী করেছে।

যাই হউক আমি লাফকাডিও হার্নএর বাড়ীতে তাঁর টেবিলে বসে তাঁর হাতের লেখা বই

পড়ে এসেছি। তাঁর স্মৃতি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত সব জিনিসপত্র—ছবি, লেখা, লাইব্রেরী দেখে এসেছি। তাঁর লেখা অনেকগুলি বই—অনেকগুলি গল্প পড়ে খুশী হয়েছি।

এখানে শিশুসাথীর পাঠকদের জন্য তাঁর লেখা ছোট একটি গল্প লিখে পাঠাচ্ছি। গল্পটির নাম—'ওশিডোরি'। অনেকদিন আগে জাপানের মাৎসু প্রদেশের 'তামুরা নো গো' জেলায় সোন্‌জো নামে একজন শিকারী বাস করতো। একদিন সে শিকার করতে ব্যর্থ হয়ে কোন শিকারই পায় নি। বাড়ী ফেরার পথে সে আকানুমা নামক জায়গায় একজোড়া 'ওশিডোরি' (পবিত্র রাজহাঁস) দেখতে পায়। সে যে নদীটি পার হচ্ছিল হংসযুগলও সেখানেই সাঁতার কাটছিল। 'ওশিডোরি' হত্যা করা ভাল নয়, কিন্তু সোন্‌জো নিজে খুবই ক্ষুধার্ত্ত ছিল—তাই সে হংসদম্পতীর দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। তার বাণে পুরুষ হাঁসটি বিদ্ধ হলো কিন্তু স্ত্রীহংসটি ছুটে পালিয়ে নদীর ওপারে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোন্‌জো মৃত হাঁসটি বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রান্না করে ফেললো।

সেইদিন রাত্রিতে সোন্‌জো এক বীভৎস স্বপ্ন দেখলো। মনে হলো যে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোক তার ঘরে তার বালিশের কাছে এসে কাঁদছে। তার কাতর ক্রন্দনে সোন্‌জোর হৃদয় যেন ছিঁড়ে যেতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি কেঁদে কেঁদে বলছিল—"তুমি ওকে হত্যা করলে কেন? সে তোমার কি অন্যায় করেছিল? আমরা আকানুমাতে দুইজনে একত্রে সুখে ছিলাম। তুমি তাকে হত্যা করেছ! সে তোমার কি ক্ষতি করেছিল? ওঃ কি হিংসার, কি অন্যায় কাজ তুমি করেছ? তুমি আমাকেও হত্যা করেছ। আমার স্বামীকে ছেড়ে আমিও বাঁচবো না···তোমাকে এই কথাটা জানাবার জন্যই আমি এসেছিলাম"···সে আবার জোরে কাঁদতে লাগলো। তার কাতর ক্রন্দন শ্রোতার অস্থি-মজ্জার মধ্যে বিঁধতে লাগলো। এর পর সে একটি জাপানী কবিতা আবৃত্তি করলো, তারপর বললো, "তুমি জান না—জানতে পারবে না তুমি কি করেছ! কিন্তু কাল যখন তুমি আকানুমাতে যাবে, তুমি প্রত্যক্ষ করবে···তুমি প্রত্যক্ষ করবে···" এই বলে সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

সোন্‌জো প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করলো। তখন তার মনে পড়লো সেই কথাগুলি—"কিন্তু কাল যখন তুমি আকানুমাতে যাবে, তুমি প্রত্যক্ষ করবে···তুমি প্রত্যক্ষ করবে।" সে তৎক্ষণাৎ সেখানে যেতে মনস্থির করলো, কারণ সে জানতে চায় যে স্বপ্নটি কি শুধুমাত্র স্বপ্নই না অন্য কিছু!

সে আকানুমাতে চলে গেল এবং সেখানে সে যেই নদীতীরে গিয়েছে অমনি দেখতে পেল স্ত্রী 'ওশিডোরি' একা একা সাঁতার কাটছে। সে সোন্‌জোকে দেখতে পেল, কিন্তু পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করে অদ্ভুত অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সোজা তার দিকে সাঁতরিয়ে এলো। তারপর নিজের ঠোঁট দিয়ে নিজের দেহকে বিচ্ছিন্ন করে শিকারীর চক্ষুর সম্মুখে আত্মহত্যা করলো—

সোন্‌জো এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর নিজের মাথা ন্যাড়া করে সন্ন্যাসী (বৌদ্ধ পুরোহিত) হয়ে গেল।

বিজ্ঞান-পত্র

॥ সঞ্জয় ॥

ভাষা শেখ ॥

কথাটা শুনে অনেকেই হয়ত তোমরা ভাবছ, ভাষা শেখা আবার এমন কি কঠিন কাজ? ছোটকালে বাবা-মা'র মুখ থেকে কত রকমের কথা শুনতে শুনতেই তো কত রকমের ভাষা শেখা হয়ে গেল। কত রকম মানে? হ্যাঁ, নিশ্চয়। বাবা-মা বাংলা ছাড়া কি আর কোন ভাষায় কথা বলেন না? দুধওয়ালার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলেন, বড় দোকানে কোন জিনিস কিনতে গিয়ে যে লোকটা বিক্রী করে তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলেন—এই তো গেল তিনটে ভাষা। স্কুলের মাস্টার মশায়ের মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনতে হয়। সেটাও একটা ভাষা। আর মেজদা সেদিন কি একটা ছবি দেখে এসে ইকির-মিকির করে গান গাইছিল! জিজ্ঞেস করতেই বলল, এ তোরা বুঝবি না, এ হোল বাবা, আসল উর্দু ভাষা। একেবারে মোগলাই চিজ। মানে, মোগলরা, আরে সেই বাবর, হুমায়ুন যাঁদের নাম হিসট্রিতে পাওয়া যায় তাঁরাই তো এই ভাষা তৈরী করেছিলেন নিজেদের মধ্যে কথা বলার জন্যে। মেজদাই তো বেশ কয়েকটা উর্দু শব্দ শিখিয়ে তবে ছেড়েছে। তবে হ্যাঁ, সেদিন কোন এক খাঁ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেজদাকে কেমন যেন নাকাল হতে হয়েছে মনে হোল। খাঁ সাহেবের বাড়ী লখ্‌নৌ। উর্দুতে নাকি পণ্ডিত তিনি। বাবার বন্ধু, কলকাতায় এসে বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। মেজদা'র মুখে উর্দু শুনে বললেন, না না হোয় নি। তুমি বলতে পারলে না খোকা। উচ্চারণটা তোমার হোলো না—। আমরা তো তাঁর মুখে বাংলা উচ্চারণ শুনে হেসেই কুটিপাটি।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক তাই। ভাষা যদি শিখতে চাও ভাল উচ্চারণ করতে শেখ। হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী কত ভাষা কত মানুষের মুখেই তো তোমরা শোন। তোমরা নিজেরাই হয়ত বলে থাক। কিন্তু নিজের ভাষা যদি নিজের কানে শুনতে পারতে তা হলে কখনও কখনও নিজের সম্পর্কে ঠিক ঐ রকমই মন্তব্য করতে যেমন করেছিলে উর্দু পণ্ডিতের মুখে বাংলা ভাষা শুনে। আসলে ভাষার মাধুর্য হোল ঐ উচ্চারণ। পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারলে নিজেরও যেমন ভাল লাগে, অপরেও ভাল বুঝতে পারে এবং খুশী হয়। ভাষার ভুল উচ্চারণে নিজের কথা পরকে বোঝান শক্ত হয়। ফলে পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষাতেই দেখবে কত রকমের উচ্চারণ। হুগলী জেলা এবং মুর্শিদাবাদের দুজন মানুষ বাংলা ভাষাতে কথা বললেও তাদের উচ্চারণে এত পার্থক্য থাকে যে দুজনের মধ্যে নিজেদের ভাব-বিনিময় বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। যেমন ধর, মূল ইংরেজী উচ্চারণ এবং আমেরিকান ইংরেজী উচ্চারণে এত তফাৎ যে, যারা ভাল ইংরেজী জানে তাদের পক্ষেও একজন খাস আমেরিকানের মুখের ইংরেজী বোঝা যথেষ্ট শক্ত। এ ছাড়াও উচ্চারণ ভুল হলে শব্দের বানান ভুল হওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভালভাবে

উচ্চারণ করে ছোটকাল থেকে যে মেরা যদি ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি শিক্ষণীয় ভাষা রিডিং পড়ার অভ্যাস কর তা হলে দেখবে বানান ভুল অনেক কমে গেছে। এমন কি সেই সঙ্গে নিজেদের বানিয়ে লেখার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে।

তা হলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, ভালভাবে উচ্চারণ শেখা কি করে সম্ভব? এ ব্যাপারে নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে। যাঁরা ভাল উচ্চারণ করতে পারেন তাঁদের মুখের কথা শুনেও নিজের ভুল উচ্চারণ দূর করা যায়। কিন্তু খুব শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। সেই কারণেই কোন কোন দেশে ভাল কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ সমন্বিত ভাষা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার্থীরা এই রেকর্ড শুনে সেইভাবে উচ্চারণ করতে শেখে। তবে এই পদ্ধতিতে সময় লাগে অনেক বেশী। অনেক সময় ফলও ভাল হয় না। দেখা গেল উচ্চারণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে যিনি উচ্চারণ করছেন তাঁকে সামনে দেখতে পারলে কাজটা আরও সহজ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বক্তা যদি সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, তাঁকে দেখে, বিশেষ করে কথা বলার সময় কি ভাবে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, মুখের চেহারা কেমন দাঁড়াচ্ছে এগুলি শ্রোতার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভাষার উচ্চারণ শেখা আরও সহজ হয়ে যায়। এই কারণেই কোন কোন দেশে ভাষা উচ্চারণ শেখানটা সিনেমার ছবিতেই সারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ছবিতে মাস্টারমশাইকে দেখতে পায় কথা বলছেন, আর রেকর্ডে সেই কথা কানে ভেসে আসছে।

তবু দেখা গেল কাজটা এখানেই শেষ হয় নি। ছাত্রকে উচ্চারণ তো শেখান হোল। কিন্তু তার পরীক্ষা? উচ্চারণটা কেমন হোল সেটা তো একবার বাজিয়ে দেখতে হয়? আর এখানেই যত গোলমাল। এ তো আর খাতায় আঁক কেটে পরীক্ষা দেওয়া নয়? পরীক্ষকের সামনে তাকে দাঁড়াতে, অনর্গল শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলে যেতে হবে। ভাবতেই কেমন লাগে। ঠিক গান শেখার মত। আড়ালে যদিও বা হয়, পরীক্ষকের সামনে মুখ দিয়ে শব্দ কেমন যেন এলোপাথাড়ি বেরুতে থাকে। কত কষ্ট করে উচ্চারণ শিখলে 'বেংগল'। মুখ দিয়ে তখন বেরুল 'ব্যাংগল'। অর্থাৎ কেমন যেন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব এসে সমস্ত পণ্ড করে দিয়ে যায়। একটা সংকোচ দানা বেঁধে সব মাটি করে দেয়।

বৃটেনের বৈজ্ঞানিক এবং ভাষাবিদ্‌রা একটা নতুন উপায় বের করেছেন। কয়েকটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নতুন এক পদ্ধতিতে ভাষার উচ্চারণ শেখানর সাজসরঞ্জাম তৈরী করে বাজারে চালুও করে দিয়েছেন। এই সরঞ্জামের মধ্যে আছে কতকগুলি টেপ রেকর্ডার, ৩৫ মিলিমিটার ফিল্ম দেখানর যন্ত্রপাতি এবং আরও কিছু ছোটখাটো যন্ত্র। ছোট ছোট ঘেরা জায়গার মধ্যে ছাত্ররা বসে এক একজন করে। জায়গাগুলি আংশিক শব্দ নিরোধক। কিন্তু সম্মুখের অংশ কাঁচে ঘেরা থাকায় শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক এবং ছবির পর্দা দেখতে পায়। ছাত্রের কানে থাকে হেড ফোন। তারা ছবি দেখে, উচ্চারণ শোনে। তারপর নিজেরা সেইভাবে উচ্চারণ করতে থাকে। তাদের প্রত্যেকের কাছেই থাকে একটি করে টেপ রেকর্ডার। নিজেদের উচ্চারণ সেই রেকর্ডে তুলে নেয়।

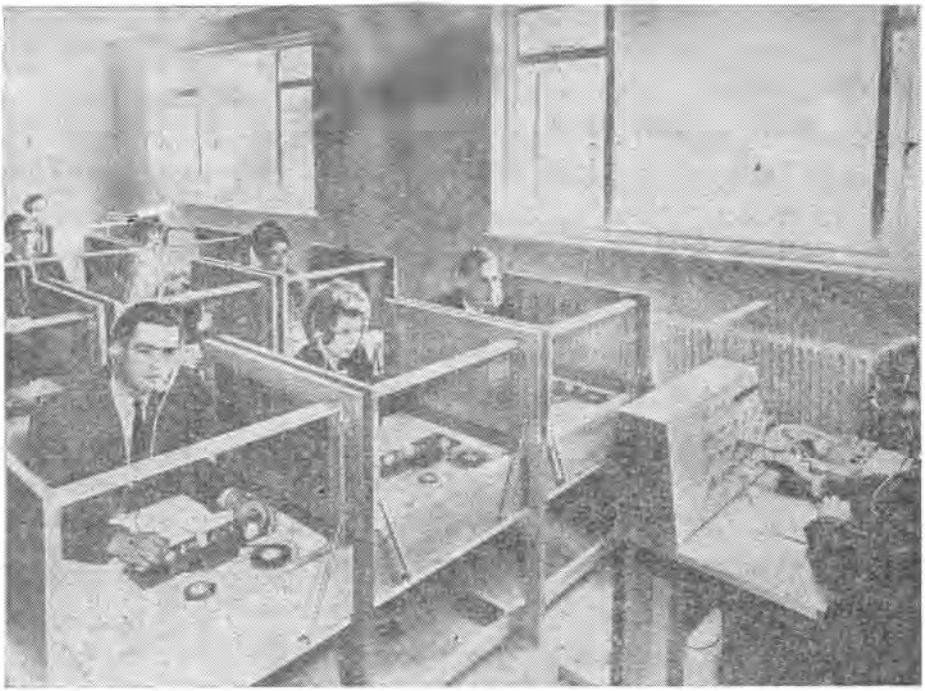

ইংলণ্ডে নতুন পদ্ধতিতে ভাষা শেখান হচ্ছে

পরে সেই রেকর্ড চালিয়ে নিজের কানেই শুনতে থাকে, নিজের উচ্চারণ ঐ হেড ফোনের সাহায্যে। বাইরে তার কোন শব্দ হয় না। শিক্ষকের টেবিলের ওপর থাকে আর একটি যন্ত্র। তার সঙ্গে প্রত্যেকটি টেপ রেকর্ডার যুক্ত। শিক্ষক নিজের ইচ্ছেমত প্রত্যেকটি টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কার উচ্চারণ কেমন হয়েছে তা শুনতে থাকেন। ছাত্ররা কিন্তু এ সমস্ত কিছু টেরই পায় না। যার উচ্চারণ ভুল হয়, শিক্ষক টেবিল থেকেই তার ভুল ধরে দেন। সে আবার সেইভাবে উচ্চারণ করে নিজেকে শুধরে নেয়। চেষ্টা করে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে। স্বাধীনভাবে এবং নিঃসংকোচে সে কাজ করতে পারে। কারণ কারুর সঙ্গে কারুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। আপাততঃ ষোল জন ছাত্রকে একসঙ্গে ভাষা শেখানর জন্যে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি কিনতে হয় তার দাম প্রায় ২,৫০০ পাউণ্ড বা ৩৬,০০০ টাকার মত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষক অন্য কোন রেকর্ড থেকেই উচ্চারণ শিখিয়ে থাকেন।

তা হলে বুঝতেই পারছ ভাষা শেখা সহজ নয়।

শরীরচর্চার ৈঠক

॥ বিশ্বশ্রী মনতোষ রায় ॥

আমার ছোট ছোট ভাইবোন সব,

বল, তোমরা সব কেমন আছো? দেখলে তো—দেখতে দেখতে কত আশায় কত বাসনায় ৩৬৫ দিনে গড়া বছরটা কেমন পাশ কাটিয়ে চলে গেল? পারলে মায়া-মমতা দেখিয়ে বা রাগ-মান করে আঁকড়ে ধরে রাখতে? পারা যায় না, পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যা দিয়ে এই চলমান বছরটাকে ধরে রাখা যেতে পারে। তার কাজ সে নীরবে করে যাবেই। কারো প্রশংসায় সে তার গতি মন্থর করে না বা কারো ভয়ে সে দু'দিন আগেও পালিয়ে চলে যায় না। ঠিক দিনে ঠিক সময়ে টা-টা করতে করতে চলে যায় বটে, আবার দিয়েও যায় আর একটি নতুন বছর উপহার।

এবার বল তো এ উপহার তোমরা কি ভাবে যত্ন করে রাখবে? বিগত বছরটির কাছ থেকে কল্যাণের নিমিত্ত যা কিছু পেয়েছো—তার সাথে ভাল কিছু সংযুক্ত করতে পারলে উপহারটি যথেষ্ট প্রয়োজনে লাগবে। দেখবে এমন অনেক না পাওয়া জিনিস ঐ উপহারের ভেতর খুঁজে পাবে।

সত্যি কথা, বিগত বছরটা যেন একটা বিরাট প্রহেলিকার সাথে প্রতিযোগিতায় মত্ত ছিল। বারোটি মাসে গড়া একটি বছরের প্রতিটি মাসে একটা না একটা স্মরণীয় তিথি রেখে গেছে। কত মহামানবের মহাপ্রয়াণ হলো। আবার কত এলো, কত রাজ্যে কত সমস্যার সৃষ্টি হলো, তার কিছু বা সমাধান হলো। বেঁচে থাকার দাবি নিয়ে মানুষ পথে পথে ক্ষেপার মত তাণ্ডব করলো—নিষ্কৃতি পেলো গুলি খেয়ে। কত মায়ের ভরা কোল খালি হয়ে গেল। কত লোক সর্বহারা হলো। দেশের কত সম্পদ বিনষ্ট হলো, একটু মানসিক উত্তেজনার ভুলে। রাজ্য সরকার হিমসিম খেতে লাগলো—এসব উত্তেজনা শান্ত করতে গিয়ে। স্মরণাতীত কালের ইতিহাস—পূর্ণ ২৪ ঘণ্টার হরতালের ডাক বাংলাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দিয়েছিল। জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদলের একান্ত সঙ্গী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলির প্রধান ফটক দীর্ঘকালের জন্য তালা বন্ধ থেকে—নিত্যসাধনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতার পরীক্ষা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল, কিন্তু এতে হলো কি আর হলোই বা কেন? এর অভিনব অভিশাপের বন্যা যেন বয়েই চলেছে। এমন কতগুলি তাজ্জবপূর্ণ নাটকীয় ঘটনা—দেশে এত সব জ্ঞানী-মানী-সুধীজন থাকতে বেমালুম ঘটে গেল কি ভাবে? প্রতিরোধের কেউ কোন হদিসই খুঁজে পেলেন না?

আমার ধারণা এমনি লক্ষ্যহীন ভাবে আন্দোলন করে পৃথিবীর কোন দেশের কোন সমস্যার সমাধান হয় নি। হয়েছে উভয় পক্ষের আত্মীয়তাপূর্ণ আলোচনার দ্বারা। আর যদি সেই আলোচনায়ও কোন সমাধান না হয়—সেক্ষেত্রে এক পক্ষের মৌন হয়ে থাকা ঢের ভাল। তাতে রাগ-মান-ক্রোধ সবকিছু ধীরে ধীরে থেমে আসে। জাতীয় সমস্যাটা আমার তোমার একার নয় এটা সমষ্টিগত। প্রত্যেকের সমান দায়িত্ব আছে সমাধানের সূত্র ধরে এগিয়ে চলার। সেই চলার

পথে বাধা আসাটা যেমন নিন্দনীয় তেমনি বাধার বিরুদ্ধে জাতীয় সম্পদ বিনষ্টের উত্তেজনাও ক্ষতিকারক। কোনটাতেই জাতীর কল্যাণের ভূমিকা নেই। এমনি করেই একটা দেশ অপর দেশের কাছে হাসির বিষয়বস্তু হয়ে শেষ পর্যন্ত বদনামের ভাগী হয়।

শান্তিতে বাঁচার অধিকারও সবার সমান। বাঁচা শুধু খাদ্য দিয়েই নয়। জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবেক এবং শক্তি-সাহস দিয়ে বাঁচাটাই মানুষের আসল বাঁচা। সেখানে অরাজকতার সৃষ্টি হলে—শয়তানী শক্তিরই প্রাধান্য হয় বেশী। শান্তি তখন সরে গিয়ে, উপঢৌকন স্বরূপ অশান্তি-অনটন দিয়ে যায় শান্তি ভোগ করতে।

দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির জন্য আলোচনামূলক আন্দোলন করাই ভাল। তা না করলে একটা বলিষ্ঠ জাতি গঠন হতে পারে না। ধ্বংসের তাণ্ডব লীলার অংশীদার হয়ে আপন মনে বিকার সৃষ্টি করো না। এতে কোন সুফল হয় না, হতে পারে না। আজ তোমাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ—নববর্ষে দেশ ও জাতির নবসংস্কণের সঙ্কল্প যেন আমাদের অক্ষয় হয়।

এবার তোমাদের কতগুলি অতি পুরাতন চিঠির জবাব দিচ্ছি। পড়ে শেখো—কাজে লাগাও।

তপন মুখার্জ্জি (কুচবিহার)। প্রঃ—বহু চেষ্টা করেও ভাল স্বাস্থ্য তৈরী করতে পারছি না। আপনার সাহায্য নিতে চাই—দেবেন? বয়স এখন বারো।

উঃ—বয়স লিখেছো বারো—আবার লিখেছো বহু চেষ্টা করেও···বাবা তুমি তা হলে কত বছর ধরে ব্যায়ার করছো জানতে পারি? এরই মধ্যে হা-হতাশ? সবুর কর, কি ব্যায়াম করছো জানতে চাই।

অমর দত্ত (হুগলী)। প্রঃ—দু'বছর আগে আমার টাইফয়েড হয়েছিল, সেই থেকে শরীর ভাল হচ্ছে না। বয়স প্রায় ১৮।১৯ হয়ে গেল। সবাই খুব চিন্তায় আছেন, আমাকে দিয়ে কি আর কোন কাজই হবে না? অনেকেরই তো টাইফয়েড হয়—সবার তো অমন হয় না।

উঃ—ঐ অসুখের পর শরীরের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। এ রোগে সাধারণতঃ পেটের ভেতরের যন্ত্রগুলিকে খুব কমজোরী করে দেয়—তাই খাদ্য খাওয়ায়, পরিশ্রম ইত্যাদিতে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার দরকার, তার ব্যতিক্রমে এই অবস্থা। খাদ্য-খাওয়া থেকে তোমার শরীরে পুষ্টি হতে পারছে না, কারণ হজমের যন্ত্রটি এখনও ভাল করে চালু হয় নি। এক কাজ কর—খুব সকালে একটু গরম কিছু খেয়ে সম্ভব হলে গঙ্গার দিকে বা ফাঁকা জায়গায়, এক ঘণ্টা বা আধ ঘন্টা বেড়িয়ে এসে—সহ্য হয় তেমন গরম জলে ১০ মিনিটের জন্য পা ডুবিয়ে রাখবে; তারপর বিশ্রাম নিয়ে দুধ, বেলের সরবৎ পাতলা করে এক গ্লাস খেয়ে নেবে।

স্নানের আগে নিজে নিজে সরষের তেল বেশ করে মালিশ করবে।

দুপুরে—ভাত, সব্জির সুপ ১ কাপ, একটু তেতো, মাছ, ডাল, তরকারী, এবং দুধ কলা খাবে।

বিকেলে—ছানা, পাকা পেঁপে, শশা খাবে।

রাত্রে—ভাত বা রুটি, ে.পের তরকারী, মাছের ঝোল, অল্প কিছু সব্জি সেদ্ধ খাবে। রাত্রে ডাল খাবে না। রাত্রের খাবারটা—রাত ৮টার মধ্যে শেষ করে ফেলবে।

এই নিয়মে একমাস চলে আমায় সংবাদ দেবে। শরীরের ওজন অবশ্যই বাড়বে।

ফুলু ও প্রদীপ রায় (এটা, ইউ. পি)। প্রঃ—আমার বয়স দশ, ভাইয়ের বয়স ছ'। ভাই বোন দু'জনেরই টনসিল। ফলে কেউ আর লম্বা হচ্ছি না—আর দেখতে হাড়গিলে।

উঃ—ভাল হতে পারে যদি সেপ্‌টিক না হয়ে থাকে। ডাক্তারকে দেখিয়ে ডাক্তারের উত্তর জানালে আসন শিখিয়ে দেবো। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কখন কি খাও জানতে পারলে পেট ভাল থাকার খাবার ব্যবস্থা দিতে পারি।

আজ এখানেই শেষ করি; পরের মাসে দেখা হবে আবার। ইতি —তোমাদের মনতোষদা

নানা কথা

॥ অমিতাভ চক্রবর্তী ॥

শিশুসাথীর নতুন বছর শুরু হল। নতুন বছর আমাদেরও। নতুন বছরের গোড়াতেই খুব ভালো ভালো খবর দেবার ইচ্ছে আমার ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভালো খবর দেবার উপায় নেই। দেশে খাবার নেই—এই নিয়ে দেশ জুড়ে শুরু হলো আন্দোলন। বসিরহাটে যা ঘটেছিল আগের মাসে তোমাদের তা জানিয়েছি। ১০ মার্চ ছিল 'বাংলা বন্ধ'। সেদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় যা ঘটে গেল এক কথায় তা হলো, অগ্নিকাণ্ড, পুলিসের গুলি, মৃত্যু। সব মিলিয়ে আমাদের ক্ষতিই হয়েছে। আমাদের ট্রেন পুড়েছে, আমাদের অফিস পুড়েছে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনরাই প্রাণ হারিয়েছেন। এতটা তীব্রতা এখন নেই। কিন্তু আন্দোলন চলছে। ৬ এপ্রিলও আবার হরতাল ডাকা হয়েছে। স্কুল-কলেজ বন্ধ। পরীক্ষা একটার পর একটা পিছিয়ে যাচ্ছে। পড়াশুনোর নামগন্ধও কোথাও নেই। কবে স্কুল-কলেজ খুলবে, কবে পরীক্ষা শুরু হবে তা এখনও স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।

এক কথায় দেশের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। তোমাদের অবস্থা আরও খারাপ। তবু তোমাদের বলবো, কোন রকম হৈ-চৈ করবে না, কোন গোলমালে থাকবে না। স্কুল-কলেজ না খোলা পর্যন্ত বাড়িতেই পড়াশুনো চালিয়ে যাও। যারা পরীক্ষা দেবে তারা একটুও আলসেমি করবে না। যে কোন সময় পরীক্ষা দিতে হবে ভেবে নিজেকে প্রস্তুত রাখো।

এবার শোনো টুকরো খবর। ১ মার্চ একটি সোভিয়েট মহাকাশযান শুক্রগ্রহে গিয়ে পৌঁছেছে। মিজো এলাকায় মিজোদের সশস্ত্র আক্রমণে ওখানকার শাসনব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়।

পরে অবশ্য অবস্থা ক্রমশ ভালো হতে থাকে। আইজলেও গোলাগুলি হয়। পুলিস বিদ্রোহীদের উপর গুলি চালাতে বাধ্য হন। ভাইস অ্যাডমিরাল শ্রী এ কে. চ্যাটার্জি ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ হয়েছেন। এর আগে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন ভাইস অ্যাডমিরাল শ্রী বি. এস সোমান। ইনদোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ লেঃ জেনারেল সুহার্তোর কাছে শাসন চালানোর সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন। এবার থেকে সুকর্ণ নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট। ৬ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় আসেন। রাজ্যের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে তিনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনা করেন। ভারতের প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীঅমলকুমার সরকার। এর আগে প্রধান বিচারপতি ছিলেন শ্রীগজেন্দ্র গড়কর। তিনি ১৬ মার্চ অবসর গ্রহণ করেন। কংগ্রেস দল ঠিক করেছেন ভাষার ভিত্তিতে পাঞ্জাবী সুবা প্রদেশ গঠন করা হবে, অর্থাৎ বর্তমান পাঞ্জাব প্রদেশ ভেঙে পাঞ্জাবী যাঁদের কথ্য ভাষা তাঁদের জন্য একটি রাজ্য গঠন করা হবে। এই সিদ্ধান্ত পাঞ্জাবের অনেকে মেনে নিচ্ছে না। ফলে ওখানে গোলমাল চলছে। পরে ঠিক হয়েছে ভাষার ভিত্তিতে এক পাঞ্জাবকে ভেঙে তিনটি রাজ্য গঠন করা হবে। যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপিটার ষ্টামবলিক এক সপ্তাহের জন্য ১০ মার্চ নয়াদিল্লীতে ভারত সফরে এসেছিলেন। ১২ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম কলকাতায় আসেন। দেশের খাদ্যাবস্থা, হরতাল, বিক্ষোভ, পুলিসের গুলি ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও সমাধানের উপায় বের করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৬ মার্চ আমেরিকার জেমিনি—৮ মহাশূন্যে যাত্রা করেছে। আসলে আকাশে উঠেছে দুটি মহাকাশযান। একটিতে মানুষ আছে, অন্যটিতে নেই। ২৬ মার্চ ভূপালের জগদলপুরে বস্তারের গদিচ্যুত শাসক শ্রীপ্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও নিহত হয়েছেন। তাঁর প্রাসাদে আরও ১৩ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই বন্দুকের গুলিতে মারা গিয়েছেন। ২৮ মার্চ কলকাতায় শিল্পীরা মিছিল করেছেন। টাকা তুলেছেন। এই টাকা খাদ্য আন্দোলনে নিহত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের পরিবারকে সাহায্য বাবদ দেওয়া হবে। ২৮ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা যান। যাবার পথে ফ্রান্সে নেমে প্রেসিডেন্ট দ্য গলের সঙ্গে দেখা করে যান। জনসনের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর আলোচনা সফল হয়েছে। জনসন ভারতকে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ টন খাবার-দাবার দিচ্ছেন।

মার্চ মাসের ২৮ তারিখ তোমাদের অতিপ্রিয় লেখক ৺ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর জন্মদিন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বহুদিন শিশুসাথীর পাতায় নানা বিষয়ে লিখেছেন। তিনি অনেক পরিশ্রম করে তোমাদের জন্য এমন একটি বই লিখেছেন যা পড়লে তোমরা পৃথিবীর নানা বিষয়ে জানতে পারবে। বইটির নাম 'শিশুভারতী'। এর অনেকগুলি খণ্ড। চটপট পড়ে নিও।

ছবির ধাঁধাঁ
১
২
৩
৪
৫
৬

ছবির ধাঁধা

শিশুসাথীর ছোট্ট বন্ধুরা,

এবারে তোমাদের প্রায় সকলের পড়া ও পরিচিত দেশ-বিদেশের ছড়া, গল্প, উপন্যাসের ছবি দিয়ে মজাদার একটা ধাঁধা তৈরী করা হ'ল। ১ থেকে ৬ নম্বর পর্যন্ত ছ'টা ছবি আছে এই ধাঁধায়। তোমরা ছবিগুলো দেখে উত্তর পাঠাও। কোন্ ছবিটা কোন্ গল্পের? গল্পের লেখক কে? ছবি ও লেখা কার?

২০শে বৈশাখের মধ্যে উত্তর আমাদের কাছে পৌঁছান চাই। সর্বপ্রথম সঠিক উত্তর যে পাঠাবে, সে পাবে ৫ টাকা দামের বই। উত্তরের সঙ্গে উত্তরদাতার নাম, বয়স আর গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করবে।

খেলাধূলা

॥ শ্রীঅমিতাভ ॥

একেবারে খাস লণ্ডনের বুক থেকে দিনে দুপুরে উধাও হয়ে গেল নিরেট সোনার কাপটি। আড়াই হাজার পাউণ্ড মূল্যের এই সোনার কাপটি ফ্রান্সের মিঃ জুলেস রিমেট উপহার দিয়েছিলেন বিশ্ব ফুটবল সংস্থাকে; উপহার দেন বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য। মিঃ জুলেস রিমেট ছিলেন বিশ্ব ফুটবল সংস্থার একসময়ের সভাপতি, আর তাঁরই নামানুসারে এই বিশ্ব কাপের নামকরণও হয় জুলেস রিমেট কাপ।

এবার বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ইংলণ্ডে। তাই কিছুদিন পূর্বে এই জুলেস রিমেট কাপ ব্রেজিল থেকে লণ্ডনে এসে পৌঁছায়। এই সময় লণ্ডনে ওকটি বিশ্ব স্ট্যাম্প এবং স্পোর্টস প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিশ্ব কাপের উদ্যোক্তা ইংলণ্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েসন এই স্বর্ণ কাপটি সাধারণের দেখার জন্য প্রদর্শনীতে রাখার অনুমতি দেন।

এই সময় একদিন দুপুরবেলা দেখা গেল সোনার জুলেস রিমেট কাপটি অদৃশ্য হয়েছে। সঙ্গে

সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডের গোয়েন্দা বাহিনী এসে পৌঁছলেন ঘটনাস্থলে। প্রথমেই তাঁরা দীর্ঘ-শীর্ণ-শ্যামবর্ণের একজন লোকের অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন কাপ চুরির আগে নাকি লোকটিকে ঘটনাস্থলের আশে পাশে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। কয়েকদিন বাদে ৪৭ বছর বয়সের ডক শ্রমিক এডোয়ার্ড ওয়াল্টার ব্লেচলীকে পুলিস গ্রেপ্তার করল। ঠিক পরের দিন বিশ্ব কাপের নীচের দিকের সোনার পাতটি কে বা কারা ডাকযোগে ইংলণ্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি মিঃ জিও মায়ারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। কাপ চুরি হওয়ার পর ঠিক অষ্টম দিন আশ্চর্যভাবে কাপটি পাওয়া গেল। মিঃ ডেভিড ফরবেট তাঁর কুকুর 'পিকলস'কে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। একটা ঝোপের মধ্যে থেকে একটা কাগজের বাণ্ডিলে জড়ানো সোনার জুলেস রিমেট কাপ টেনে বার করল 'পিকলস্'। ইংলণ্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েসন কাপটিকে জুলেস রিমেট কাপ বলে সনাক্ত করেছেন। এখন মিঃ করবেট তাঁর কুকুরের জন্য দু'হাজার পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করবেন। আর কুকুরটি আবার একটি সিনেমায় অভিনয় করবে প্রতিদিন পঁচিশ পাউণ্ডের বিনিময়ে। বইটির নাম হবে 'দি স্পাই উইথ কোল্ড নোজ'।

বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস মহম্মদ আলি ক্লে তাঁর পেশাদার মুষ্টিযুদ্ধের আর একটি মুষ্টিযুদ্ধে বিজয়ী হলেন। এবার অবশ্য তিনি খুব ভাল ফলাফল প্রদর্শন করতে পারেন। এবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কানাডার হেভীওয়েট মুষ্টিযুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান জর্জ শিভালো। প্রথমে কথা ছিল যে ক্লে আর আর্লি টেরেলের লড়াই অনুষ্ঠিত হবে ২৯শে মার্চ টরেণ্টোয়। কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে মতবিরোধ হবার ফলে শেষ পর্যন্ত ক্লে-টেরেল লড়াই ভেস্তে যায়। জর্জ শিভালোর বয়স বর্তমানে ২৯ বছর। ক্লে কোনক্রমে পনেরো রাউণ্ডে শিভালোকে পরাজিত করেন।

ভারতের প্রখ্যাত সাঁতারু শ্রীমিহির সেন ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছিলেন। এবার তিনি পক প্রণালী অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সিংহল এবং দক্ষিণ ভারতের ধনুস্কোণ্ডির মধ্যে ভারত মহাসাগরের ৩০ মাইল জলভাগকে বলা হয় পক প্রণালী। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় এই পক প্রণালী অতিক্রম করতে সমর্থ হয় নি। পক প্রণালীতে সাঁতার দেওয়া সত্যই বিপজ্জনক। কারণ বিষাক্ত সাপ এবং হিংস্র হাঙ্গর জাতীয় জন্তু খুব বেশী দেখা যায় পক প্রণালীতে। শ্রীমিহির সেনের এই কঠিন প্রয়াস সফল হয়েছে।

কলকাতা হকি লীগ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। কোন দল যে লীগ-বিজয়ী হবে তা বলা যাচ্ছে না। কারণ বি. এন. রেল এখনও একটি পয়েন্টও নষ্ট করে নি, কিন্তু মোহনবাগান এবং ইস্টার্ণ রেল নষ্ট করেছে একটি করে পয়েন্ট এবং ইস্টবেঙ্গল নষ্ট করেছে মোট তিন পয়েন্ট।

———

সম্পাদিকার চিঠি

প্রিয় বন্ধুরা,

নববর্ষের এই শুভদিনটিতে তোমাদের সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। আজকের এই বিশেষ দিনটিতে তোমাদের প্রিয় শিশুসাথীর ৪৪ বৎসর পূর্ণ হল। শুভজন্মদিন বারবার শিশুসাথীকে নূতন করুক। দীর্ঘজীবী হোক শিশুসাথী।

শুভ-নববর্ষের এই প্রথম দিনটি মধুময় করে তুলুক আকাশ-বাতাস-অন্তরীক্ষ। মধুর হোক, সার্থক হোক আগামী দিনের অদেখা ক্ষণগুলি।

প্রতি দিনের সূর্যোদয় যেমন করে প্রতিটি দিনের মলিনতা মুছিয়ে, নূতন জীবনী-শক্তিতে ভরপুর করে উপহার দেয় আমাদের, নববর্ষও ঠিক সেইভাবে প্রতিবার আমাদের কাছে উপস্থিত হয় কত নূতন সম্ভাবনা, কত নবীন আশার আলো জ্বালিয়ে। তাকে সার্থক করে তোলার ভার মানুষেরই হাতে। জীবনের মধ্যে যে অসীম সম্ভাবনা নিহিত আছে, প্রতিটি নববর্ষ মানুষকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ কথা সত্য যে, জীবনের পথে জটিল সমস্যাগুলি উপেক্ষার নয়। সেগুলি ক্রমাগতই কাঁটা ফোটাতে থাকে। বারে বারে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষকে অদম্য আশায় এগিয়ে চলতে হবে, আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করে।

বিগত বছরে ঘরে বাইরে কত যুদ্ধ আর সমস্যা আমাদের কত ভাবে বিপর্যস্ত করেছে। কত প্রিয়জনকে আমরা হারিয়েছি। কত ক্ষয়ক্ষতির ঝড় বয়ে গেছে দেশের মাটিতে। হিংসা আর উত্তেজনার বিষে ভরে গিয়েছে চৈত্রশেষের দিনগুলি। দিনের পর দিন বন্ধ রয়েছে দেশের বিদ্যাভবনগুলি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা, ক্ষতি হয়েছে ছাত্রসমাজের। নষ্ট হয়েছে জাতীয় সম্পত্তি। কিন্তু এসব সমস্যার কোন সমাধানই হিংসা নয়, উত্তেজনা নয়। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না। যত বড়ো কঠিন সমস্যাই হোক, মানুষের শুভবুদ্ধির দৃঢ়তাই আনবে তার সমাধান।

মানুষের কল্যাণবুদ্ধি মানুষকে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর করতে পারে। ভারতের ভাবী নাগরিক তোমরা। নববর্ষে এই তোমাদের সঙ্কল্প হোক—কোন উত্তেজনা, কোন অশান্তি যেন তোমাদের বড়ো হবার পথে বাধাসৃষ্টি করতে না পারে। শিক্ষায়, ব্যবহারে, বুদ্ধিতে, সাহসে উপযুক্ত হয়ে তোমরা যেন আগামী দিনের ভারতবর্ষকে সার্থক করে তুলতে পারো।

আজ প্রণাম জানাই লোকগুরু অমিতাভ বুদ্ধকে। সুদূর অতীতে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল মহারাজ শুদ্ধোদনের উত্তরাধিকারীরূপে।

রাজপুত্র হয়েও তিনি মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য রাজগরিমা ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের কাছে চলে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একটি আলোচনা এ সম্বন্ধে স্মরণীয়—"দুঃখ তিনি সত্যিই দূর করতে পেরেছিলেন কি না, সেটি বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না, সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে!"

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনই এক বিরাট সাধনা। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর বই তোমরা পড়ো, তাঁর জীবনসাধনাকে জানবার আগ্রহ হোক। তাঁর সুরের ঝরণা তোমাদের দিনগুলিকে রঙে রসে অভিষিক্ত করুক। সেটাই হবে কবিকে স্মরণের শ্রেষ্ঠ উপায়। কেবলমাত্র বিশেষ একটি দিনে কিছু নাচ-গান-আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা সার্থক হয় না। কবির বলিষ্ঠ মানবতার আদর্শকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার চেষ্টা করো। জীবনকে গঠন করার জন্য মহৎ আদর্শের বড়ো প্রয়োজন।

এবারে অন্য প্রসঙ্গ। গত ৬ই এপ্রিল, বুধবার, শ্রীযুক্ত মিহির সেন বিপদসঙ্কুল পক প্রণালী অতিক্রম করে ভারতবাসীর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তার এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। শ্রীযুক্ত সেনই প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী ভারতীয়। ইংলিশ চ্যানেল এবং পক প্রণালী অতিক্রমকারী সাঁতারুরূপেও শ্রীসেন এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করলেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

আজকের চিঠি এখানেই শেষ করি। শুভার্থিনী

১লা বৈশাখ, ১৩৭৩ তোমাদের সম্পাদিকা

সম্পাদিকা—শ্রীমতী দাশগুপ্ত
৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীনারসিংহ প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ও
শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত

বিজ্ঞানের চিঠি

১৫৭ খানা বর্ণ ও রেখাচিত্র সম্বলিত
আলোক বিজ্ঞান থেকে শুরু করে অণু-পরমাণুর অঙ্গ সংস্থান ইতিহাস, পরমাণুর কেন্দ্রতত্ত্ব পরিমাণ বাদ, জ্যোতিষ্ক পদার্থ-বিজ্ঞান, আপেক্ষিকতা বাদ সকল বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। মূল্য ১০·০০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

অনেক দিনের অনেক গল্প

রাজা, রাণী, রাজপুত্তুর
কলু, মুদী, কুড়ে চাষা,
বাঘ, সিঙ্গী, কাঁকড়া, বেড়াল,
বাঁদর, উটের কথায় ঠাসা।
হাতে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছা করবে না।
সচিত্র সংস্করণ—২·০০

তোলপাড় ২·০০
কালোপাখী ৩·৫০
আলালের ঘরের দুলাল ২·০০
পূজার পড়া ১·৭৫
রঙ্গিলা ১·৫০
রকমারী ১·৫০

প্রিয়কুমার গোস্বামীর
এই বিংশ শতাব্দী ২·০০

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যের
সোনার কমল ২·০০
বাদুড়-বয়কট ১·০০

প্রতিভা দেবীর
লিট্‌ল উইমেন ৩·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

ছোটদের বেতালেরগল্প

৪·০০

মনোরম গুহ-ঠাকুরতার
রিপভ্যান উইংকল্ ১·২০
জাপানের গল্প ২·০০
ছোটদের বত্রিশ সিংহাসন ৩·৫০

হেম চট্টোপাধ্যায়ের
টো-টো কোম্পানীর ম্যানেজার ২·০০

সুনির্ম্মল বসুর
জানোয়ারের ছড়া ২·০০
বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৬১ ৪·০০
ঐ ১৩৬৯ ৪·২৫

এরোপ্লেনের গল্প ২·৫০
কাফ্রি-মুল্লুকে ১·৭৫
বনে-জঙ্গলে ২·০০
সপ্তকাণ্ড ১·৫০
টুকটুকে রামায়ণ ৩·৫০
ছুটির গল্প ১·৫০
বিচিত্র দেশ ১·০০

ধীরেন্দ্রলাল ধরের
টম কাকার কাহিনী ১·৫০
ডেভিড কপারফিল্ড ১·৫০

যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পয়সার ডায়েরী ২·২৫

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের
ঝাঁসীর রাণী ১·৫০
বাংলার ডাকাত (১ম) ২·২৫
ঐ (২য়) ২·৫০
যারা ছিল দিগ্বিজয়ী ২·৫০

ইতিহাসের পাতা থেকে সজীব হয়ে দেখা দিয়েছে এই সব কাহিনীর চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষের
টাওয়ার অব লণ্ডন ২·২৫

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে ১·০০

তারাপদ রাহার
গ্রিমের রূপকথা ১·৭৫
এণ্ডারসনের রূপকথা ২·৭৫

আশুতোষ লাইব্রেরী : ৫, বংকিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Registered No. C. 1104 বৈশাখ—১৩৭৩

শিশুসাথী

ছোটদের সেরা রুচিশীল মাসিকপত্র

এই বৈশাখে

৪৪ পার হয়ে ৪৫ বছরে পড়েছে

শিশুসাথী কখনো পুরানো হয় না—

শিশুর মতই শিশুসাথী চিরনূতন

ছোটদের মনের খোরাক জোগায় শিশুসাথী

শুধু গল্প, কবিতাই নয়—ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, ম্যাজিক, ব্যায়াম, বুদ্ধির খেলা, ছবিতে গল্প, খেলাধূলা, তোমাদের পাতা, এ সবই থাকে শিশুসাথীর পাতায়। শ্রেষ্ঠ লেখক আর শিল্পী তাঁদের লেখায় আর রেখায় সাজিয়ে দেন শিশুসাথীকে। আগামী দিনের নাগরিককে ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে শিশুসাথী। অভিভাবক আর শিক্ষাবিদ্‌রাও ছোটদের জন্য শিশুসাথীকেই পছন্দ করেন।

এ বছরের শিশুসাথী রঙে রসে এক নিমেষেই তোমাদের মন কেড়ে নেবে।

নিয়মিত বিভাগগুলির সঙ্গে নূতন বছরে সুরু হল—

* শ্রীযুক্ত ভৈরবপ্রসাদ হালদারের তথ্যমূলক অ্যাডভেঞ্চার—"বরফের দেশ"
* কিংস্‌লী ফস্টারের "Skip" অবলম্বনে শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী লিখছেন—"কুপকুপ"
* শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর "ডিটেকটিভ রতন-হিতেনের কীর্তি" শেষ হলে সুরু হবে আর একটি নূতন উপন্যাস।

যারা এখনো গ্রাহক হওনি তারা অবিলম্বে চাঁদা পাঠিয়ে নূতন বছরের পত্রিকার জন্য নিশ্চিন্ত হও।

চাঁদা (সডাক) : বার্ষিক ৫ টাকা ষাণ্মাসিক ২ টা. ৫০ পঃ প্রতি সংখ্যা ৫০ পঃ

— বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড —

৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২